বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। আনুমানিক সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলো কবিতার আঙ্গিকে রচিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্তবাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত কাব্যচর্চার ইতিহাস। উল্লিখিত সহস্রাধিক বছর বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে মৌখিক বাংলায়। বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে বলেই আঠারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সাহিত্যের বাহন না হলেও প্রাত্যহিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে লিখিত গদ্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে এ গদ্যের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বিশৃঙ্খল এই গদ্য ভাষার জন্ম মধ্যযুগের সময় পরিসরে হলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক যুগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে।

উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিস্ট ছিলেন বিদেশীরা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারী এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উইলিয়াম কেরী এবং টমাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁরাই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিশন থেকে বাংলা গদ্যে বাইবেল-এর অনুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ই ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। উইলিয়াম কেরী এক্ষেত্রেও পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসতেন তারা দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার স্বার্থেই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তাঁরই উদ্যোগে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অন্যান্য দেশীয়-ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেই কলেজটিতে শুরুর পরের বছরই (১৮০১) বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উইলিয়াম কেরী হন বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে দুটি বই রচনা করলেন এবং দেশীয় শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়েও কিছু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করালেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল :

	গ্রন্থ	রচয়িতা
১.	কথোপকথন (১৮০১) ইতিহাসমালা (১৮১২)	উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)
২.	হিতোপদেশ (১৮০২)	গোলোকনাথ শর্মা
৩.	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (ইশপস্ ফেবল্‌সের অনুবাদ (১৮০৩)	তারিণীচরণ মিত্র (আনু ১৭৭২-১৮৩৭)
৪.	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
৫.	তোতা ইতিহাস (১৮০৫)	চণ্ডীচরণ মুন্সী (১৭৬০-১৮০৮)
৬.	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) লিপিমালা (১৮০২)	রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)
৭.	বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) হিতোপদেশ (১৮০৮) রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭৬২-১৮১৯)

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়-এর (১৭৭৪-১৮৩৩)। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও চর্চায় বাংলা গদ্য ঐ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত তর্ক বিতর্কের লিখিত গদ্যরূপ বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এ ভাবেই বাংলা গদ্য বিকাশধারার পথ খুঁজে পায়। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক' 'প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৯), রামমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)।

আলোচনা 'বিতর্ক ও মীমাংসা' এবং ধর্মতত্ত্বের বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের অমিত সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ গদ্যকে সাহিত্যের বাহনের মর্যাদায় উন্নীত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-৯১)। ভাব ও বিষয় অনুসারে বাক্যবিন্যাস এবং ইংরেজি ভাষার আদলে বিভিন্ন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী অভিধায়। তবে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি প্রধানত অনুবাদক, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিক্ষা-সমাজ সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধকার। তাঁর অনূদিত, রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত(১৮৪৯), সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১) ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং লেখক হিসেবে পূর্বে আবির্ভূত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা। 'বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির' চর্চাকারী হিসেবে বাংলা গদ্যে অক্ষয় কুমারের অবদান সুচিহ্নিত। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও যে বাংলা গদ্যের বাহন হতে পারে, সে সম্ভাবনা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁর। অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : ভূগোল (১৮৪১), চারুপাঠ (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৮৫১, ১৮৫৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা(১৮৫২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয় এ সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে সৃষ্টিশীল গদ্য রচয়িতা হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-৭৩) । ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেশ কটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথিকাধর্মী রচনা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৭৭৯ শকাব্দ) বিশেষ তাৎপর্য চিহ্নিত। এ গ্রন্থের দুই কাহিনী 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-কে কোনো কোনো সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্ম নামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) গ্রন্থে। তবে 'আলালের ঘরে দুলালের' গুরুত্ব শুধু উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত প্রথম রচনা হিসেবে নয় বরং বাংলা গদ্যের পালাবদলের মাইল ফলক হিসেবেই এর সমধিক গুরুত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ব্যবহার করলেন কলকাতার চলতি বুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যবুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালী ভাষা' তাই এক স্মরণীয় মাইল ফলক। 'আলালী ভাষা' আলোচনায় 'হুতোমী ভাষা'র প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত 'হুতোম প্যাচার নক্শা'ও (১৮৬২-৬৪) কলকাতার চলতি বুলিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবধান সুচিহ্নিত ছিল না। তাঁর অনূদিত 'মহাভারতে' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শায়' ক্লাসিক সাধুভাষা ও অপভাষা মিশ্রিত চলিত বুলির ব্যবধানটি মোটা দাগে চিহ্নিত ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশক বাংলা গদ্যে মৌলিক নাট্যসাহিত্য রচনার কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার পরিচয়ে। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি

প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। মধুসূদনের নাট্যচর্চায় সম্প্রসারিত হল বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা। বাংলা গদ্য যে সার্থক নাটকের, বিশেষত গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ প্রহসনের বাহন হতে পারে, মধুসূদনের নাটক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আর এক উল্লেখযোগ্য নাম দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এর রচয়িতা হিসেবে সমধিক পরিচিত দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি 'সধবার একাদশী, (১৮৬৬) নাটক। বিষয়গৌরবের দিক থেকে 'নীলদর্পণ'-এর অসামান্যতা সত্ত্বেও গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতার কারণে 'সধবার একাদশী'র রয়েছে এক স্বতন্ত্র মূল্য। দীনবন্ধু এ নাটকে লঘুভঙ্গির ভাষার আশ্রয়ে জীবনের বেদনাবহ এক প্রান্তকে শিল্পরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'সধবার একাদশী' নাটক-এর মাধ্যমে দীনবন্ধু বাংলা গদ্যের বহুমুখী সম্ভাবনার একটি দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন সর্বসমক্ষে।

পাঠ্যপুস্তক ও তর্ক-বিতর্কের বাহন হিসেবে প্রচলিত যে গদ্য বিদ্যাসাগরের চর্চায় শিল্প মাধ্যমের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮-৯৪) সাধনায় সে গদ্য শিল্পিত উপন্যাসের ধারক হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গদ্যে, যুগপৎভাবে উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য সুপ্রমাণিত হল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম গদ্যচর্চার নতুন যে পথসন্ধান দিলেন, তাকে অনুসরণ করেই সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্য উত্তরকালে বিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ ((১৮৮৪), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২)।

মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এ যুগের একজন বলিষ্ঠ গদ্যলেখক। 'বিষাদসিন্ধু' তাঁর (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। লেখকের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য সাধনার বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশ শতকে। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধকে অভিহিত করা হয় 'রবীন্দ্রযুগ' নামে। স্মরণীয়, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষত 'গল্পগুচ্ছে' শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বেশ কটি রচিত হয় এ-সময়ে। তবে গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের শিখরস্পর্শী সাফল্য ঘটেছে বিশ শতকেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পালাবদল ঘটে। এ সময় থেকে তিনি সাধুভাষা রীতির গদ্য পরিত্যাগ করে চলিত ভাষারীতির গদ্য গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু গদ্যচর্চায় ঐ রীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চায় বিকাশমান বাংলা গদ্যভাষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মানুষের বহুমুখী আবেগ অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তাঁর সৃজনশীল চর্চায় বাংলা গদ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা বিচিত্রমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলাগদ্যের 'মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য'। রবীন্দ্রনাথের বিপুল গদ্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : **নাটক**- অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), **উপন্যাস**- চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯০৮), চতুরঙ্গ(১৯১৫), ঘরে বাইরে (১৯১৫), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)। **ছোটগল্প** - গল্পগুচ্ছ (তিনখণ্ড), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১)। প্রবন্ধ- সভ্যতার সংকট (১৯৪১)। **সাহিত্য সমালোচনা**- প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭)। **রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ**- স্বদেশ (১৯০৮) শিক্ষা (১৯০৮), কালান্তর (১৯৩৭), ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ- ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯১৩)। **ব্যক্তিগত প্রবন্ধ**- পঞ্চভূত (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), জীবনস্মৃতি (১৯১২) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও যিনি রবীন্দ্রগদ্য দ্বারা প্রভাবিত হন নি এবং রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তাঁর লেখক ছদ্মনাম 'বীরবল'; নতুন গদ্যরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গদ্য 'বীরবলী গদ্য' নামে পরিচিত। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি 'সবুজপত্র' নামের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। তিনিই প্রথম কলকাতার প্রমিত চলিত ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সম্পাদিত

'সবুজপত্র' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষারীতির গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-বীরবলের হালখাতা, নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা, গল্পসংগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা গদ্য উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেও কোটি কোটি বাঙালির জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আজও বিকাশমান। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গদ্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, সে সব সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও কৃতির পরিচয় নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল :

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)	প্রকৃতি(১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)	বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), ঘরোয়া (১৩৪৮)।
৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)	পল্লীসমাজ (১৯১৪), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০)।
৪. রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)	গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭)।
৫. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)	আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ।
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় (১৮৯৪-১৯৫০)	পথের পাঁচালী (১৯২৯), আরণ্যক (১৩৪৫), ইছামতী (১৩৫৬)।
৭. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)	শাশ্বত বঙ্গ (১৩৫৮), কবিগুরু গ্যেটে (২ খণ্ড), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।
৮. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানীপর্দা, গালিভরের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আবেহায়াত, সত্যমিথ্যা, আমার দেখা রাজীনীতির পঞ্চাশ এবং আত্মকথা।
৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)	গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), কবি (১৯৪২), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)
১০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), ব্যথার দান (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী
১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৫৭)	স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।
১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)	সংস্কৃতি (১৩৬৫)।
১৩. সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪)	দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, শবনম।
১৪. আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১)	রাঙা প্রভাত (১৯২৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা।
১৫. হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)	বাংলার কাব্য (১৯৪২)।
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)	পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), চিহ্ন (১৯৪৭)।
১৭. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)	কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, মহাভারতের কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমার যৌবন, আমার ছেলেবেলা।
১৮. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০)	বাংলার নবজাগৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১)	নয়নচারা, লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
২০. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১)	কবর, মীরমানস, বাংলা গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা।

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

পশ্চিম বাংলার নৈহাটির কাছাকাছি কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। হুগলী মোহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। কর্মজীবনে তিনি প্রথম ভারতীয় ও বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। 'তথা মানস' একটি কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় Rajmohan`s wife। সাহিত্য রচনায় ঝোঁক তাঁর বরাবরই ছিল। বাঙলা সাহিত্য সাধনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। কাব্য এবং ইংরেজি রচনা ছেড়ে তিনি গদ্য রচনায় মন দিলেন। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল 'দুর্গেশনন্দিনী'। বাঙলা সাহিত্যে এটিই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। গদ্য সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলো এ উপন্যাস। বাঙলা গদ্যেও যে উত্তম সাহিত্য রচনা সম্ভব 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাই প্রমাণ করলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু রীতির বাঙলায় যেটুকু জড়তা ছিলো, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা দূর হলো– বাঙলা হয়ে উঠলো সাহিত্যের উপযোগী ভাষা। গুণে-মানে ভাব ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুরীতির গদ্য রচনা সমাজে খুবই সমাদর পেয়েছিল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাঙলা গদ্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি অবদান রেখেছেন। তবে তাঁর বিখ্যাত রচনার মধ্যে উপন্যাসই প্রধান।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম

উপন্যাস : কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), বিষবৃক্ষ(১৮৭৩), রাজসিংহ ইত্যাদি।

রম্য রচনা : কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)।

প্রবন্ধ : বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৭-৯২), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬)।

ভূমিকা

'বিড়াল' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি রম্যরচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যতগুলো রম্য রচনা আছে, 'বিড়াল' তার মধ্যে অন্যতম। এটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি ছোট কিন্তু চির নতুন। কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক গভীর দর্শনের কথা বলেছেন। বিড়াল চরিত্রকে লেখক দরিদ্র বঞ্চিত ও শোষিত সমাজের প্রতিনিধি বা প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর ধনী সমাজের প্রতীক হলেন কমলাকান্ত। দুইজনের আলোচনায় আমাদের সমাজের আসল ছবি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে সত্যিকার মানুষ হতে হলে তাকে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে সে কথাও বলা হয়েছে। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকেই যে বিচারবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে চাইলে মানুষের ভূমিকাই যে প্রধান হতে হবে, স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে সেদিকে। রম্য রচনা হিসেবে 'বিড়াল' এক অসাধারণ প্রবন্ধ। আজো শত সহস্র পাঠক এ রচনাটি পড়ে আনন্দ ও চিন্তার খোরাক পেয়ে থাকেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনার গুণ মান ও রসবোধের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
২. লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।
৩. সাধুরীতির গদ্যও যে কতো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে পারে তা বুঝতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কিছু ঐতিহাসিক নাম ও স্থান সম্বন্ধে জানতে এবং লিখতে পারবেন।
- বিড়াল কোন সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কি কি বলছে তা বুঝতে এবং লিখতে পারবেন।

মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শয়নগৃহ – শোয়ার ঘর। **চারপায়ী** – টুল বা চৌকি। **প্রেতবৎ** – প্রেতের মতো। **নিমীলিত লোচনে** – বন্ধ চোখে। **নেপোলিয়ন** – পূর্ণনাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রিঃ) মহাবীর ফরাসী সম্রাট। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। ১৮১৫ খ্রিঃ ওয়াটার্লু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। **ওয়াটার্লু** – যুদ্ধক্ষেত্রের নাম। এখানে নেপোলিয়ন ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন। **ওয়েলিংটন** – ডিউক অব ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫৪ খ্রিঃ) নামে সমধিক পরিচিত। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। **বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া** – বিড়াল হয়ে।	আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই–এ জন্য হুকা হাতে ,নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও!" চাহিয়া দেখিলাম–হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!" তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যুহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ খাইয়া বসিয়া আছি–এখন বল কি?" বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া,

আফিঙ্গ – আফিম (পপি ফুলের রস থেকে তৈরি)।

পাষাণবৎ – পাথরের মতো।

ডিউক মহাশয় – ক্ষুদ্র রাজা, অভিজাত ব্যক্তি।

যথোচিত – যেমন উচিত।

এক্ষণে – এখন।

অপরিমিত – পরিমাণ করা হয়নি যার।

মার্জার – বিড়াল।

নিঃশেষ – একেবারে শেষ।

উদরসাৎ – খেয়ে ফেলা।

ব্যূহ রচনা – যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো।

প্রকটিত – প্রকাশ।

অভিপ্রায় – ইচ্ছা।

চিরাগত – প্রথা (বহুদিন ধরে যা হয়ে আসছে)।

অবমাননা – অপমান।

বাঞ্ছনীয় – যা চাওয়া যায় এমন।

কাপুরুষ – ভীতু পুরুষ।

সকাতর চিত্তে – কাতর মনে।

ষষ্ঠি – লাঠি।

ধাবমান হইলাম – ধেয়ে গেলাম।

সগর্বে – অহঙ্কারের সঙ্গে।

পুনরপি – আবার।

শয্যায় – বিছানায়।

দিব্যকর্ণ – অলৌকিক ক্ষমতায় শোনার কান।

মনুষ্য – মানুষ।

প্রভেদ – পার্থক্য।

ক্ষুৎপিপাসা – ক্ষুধা ও পিপাসা।

শাস্ত্রানুসারে – নিয়ম অনুসারে।

ঠেঙ্গালাঠি – লম্বা লাঠি।

আইস – আসো।

অনুসন্ধানে – খুঁজে।

বিজ্ঞ – জ্ঞানী।

সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন ষষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে ষষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও"! প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া ষষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে–আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল–অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী–আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

চতুষ্পদ – চার পেয়ে প্রাণী। **ব্যতীত** – ছাড়া। **আহরিত** – সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। **মূলীভূত** – আসল, গোড়ার। **প্রহার** – মারা। **সহায়** – সহকারী।	

সার-সংক্ষেপ

লেখক নিজেই কমলাকান্ত। হালকা কথায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিড়ালের সঙ্গে কমলাকান্তের যে কথা বার্তা সেটা তাঁর নিজস্ব চিন্তা। বিড়াল নিরীহ প্রাণী। সুযোগ পেলেই দুধ চুরি করে খায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তা যে মানুষেরই সৃষ্টি এ কথাই লেখক কমলাকান্ত সেজে বলেছেন। তাঁর মতে দরিদ্র অসহায় যারা, তারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে অন্যায় করে। তখন ধনীরা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেনো তারা অন্যায় করলো তার কারণ কখনো খোঁজা হয় না। বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কমলাকান্তের সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রূপকের আশ্রয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বিড়ালকে দুধ খেতে দেখে কমলাকান্তের কী মনে হলো সংক্ষেপে লিখুন।
২. কমলাকান্ত দিব্যকর্ণে বিড়ালকে কী বলতে শুনলেন তার বিবরণ লিখুন।
৩. বিড়াল যখন ঘরে ঢুকে 'মেও' বললো তখন কমলাকান্ত কী করছিলেন?
৪. 'ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম' - কথাটা কে কাকে কখন এবং কেন বলেছে?

নমুনা প্রশ্নোত্তর

'ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম' - কথাটা কে কাকে কখন বলেছে?

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রম্য রচনা 'বিড়াল'-এর মধ্যে বিড়ালই এই কথা বলেছে কমলাকান্তকে। দিব্যকর্ণ খুলে যাওয়ার পর কমলাকান্ত বিড়ালের মনের কথা শুনতে পেলেন। দুধ চুরি করে খাওয়ার জন্য কমলাকান্ত লাঠি নিয়ে বিড়ালকে মারতে এল। সে ভয় না পেয়ে 'মেও' অর্থাৎ কেন মারবে' প্রশ্ন করে। তারপর সে অনেক যুক্তি তোলে তার আচরণকে উচিত প্রমাণ করার জন্য। বিড়ালের মতে মানুষ নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। তারা অন্যের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে না। সে শিক্ষাও তারা পায় না। অথচ পরোপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ কথা মানুষের জানা এবং সে রকম আচরণ করা উচিত।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিড়ালের মতো অসহায় প্রাণীরা তাদের অপরাধের জন্য কী কী যুক্তি দেখায় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিড়াল কী কী বলেছে তার সার কথাগুলো নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
শিহরিয়া – শিউরে ওঠা। **প্রয়োজনাতীত** – প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। **কৃপণ** – যে শুধু সঞ্চয় করে খরচ করে না। **তদপেক্ষা** – তার চেয়ে। **শিরোমণি** – সমাজের প্রধান ব্যক্তি। **ন্যায়ালঙ্কার** – ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। **মান্য** – সম্মান পাওয়ার যোগ্য। **ভোজ** – খাওয়া-দাওয়া। **আহ্বান** – ডাকা। **দণ্ড** – শাস্তি। **প্রাঙ্গণ** – মাঠ। **প্রাসাদ** – বিশাল বাড়ি। **যুবতী** – যৌবনবতী মেয়ে। **ভার্যা** – স্ত্রী, বৌ। **সহোদর** – একই উদরে জন্ম অর্থাৎ আপন ভাই। **সতরঞ্চ খেলা** – দাবা খেলা। **উদর** – পেট। **কৃশ** – রোগা। **অস্থি** – হাড়। **পরিদৃশ্যমান** – দেখা যায় এমন। **লাঙ্গুল** – লেজ। **বিনত** – নম্র। **অবিরত** – অনবরত। **কৃষ্ণচর্ম** – কালো চামড়া। **শুষ্ক মুখ** – শুকনো মুখ। **ক্ষীণ** – দুর্বল। **সকরুণ** – অতি দুঃখপূর্ণ। **নির্দয়** – নিষ্ঠুর, দয়াহীন। **কার্পণ্য** – কৃপণতা। **দূরদর্শী** – যার ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা আছে।	"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে–চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? "দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না–সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে? "দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাতে করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়–তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ–দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর–আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর–ছি!ছি! "দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি, দিক্ দৃষ্টি করিতেছি–কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল–গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারে স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল–তবেই তাহার পুষ্টি তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে। "আর আমাদিগের দশা দেখ–আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে–জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে–অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও"! মেও! খাইতে পাই না! – আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড নাই কেন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই

বঞ্চিত – প্রতারিত, যে ঠকেছে এমন। **আহার্য** – খাবার।	কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

সার-সংক্ষেপ

বিড়াল তার চুরি করে দুধ খাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অনিয়মের কথা বলেছে। তার ব্যাখ্যায় ধনী কৃপণদের জন্যই গরিবরা চোর হয়। তাই চোরের শাস্তি হলে যারা চোর তৈরি করে, তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত বলে বিড়াল মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। বিড়াল তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছে যে, মানুষ 'তেলা মাথায় তেল ঢালে'- এটা তাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য মানুষ ভোজের আয়োজন করে। আর শুধু বেঁচে থাকার জন্য যাদের একটু খাবার প্রয়োজন, তাদেরকে কেউ খেতে দেয় না। ভোজের আসরে খেতেও ডাকে না। বরং খাবার বেঁচে গেলে তা ফেলে দেয়া হয়, তবু ক্ষুধার্তদের জন্য তা রাখা হয় না। ধনীদের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই দরিদ্র অসহায়রা চুরি করে। তাই চুরির জন্য দরিদ্রকে শাস্তি দেয়ার কোনো অধিকার নেই ধনীর।

ধনীরা দরিদ্রের কষ্ট বোঝে না। না খেয়ে থাকলেও দরিদ্রের সেবায় কেউ এগিয়ে যায় না। তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য দরিদ্ররা চুরি করে। বিড়াল বলতে চায় যে, কৃপণ ধনীরাই সৃষ্টি করে চোর। তারা একাই পাঁচশো জনের সম্পদ ভোগ করে। এটাও সামাজিক অন্যায়। চোরের শাস্তি হলে ধনী কৃপণদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ তারাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে। পৃথিবীতে সবাই বাঁচতে চায় বলেই চুরি করে খেয়ে বাঁচতে হয় চোরকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর' - এ কথা কে বলেছে এবং কেন বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

২. বিড়াল কমলাকান্তকে 'দূরদর্শী' কেন বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. বিড়ালের মতে 'মনুষ্যজাতির' কী কী দোষ, সংক্ষেপে লিখুন।

৪. দরিদ্রের চুরি করাকে বিড়াল ঠিক কাজ মনে করেছে কেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৫. বিড়ালের যুক্তিগুলো কী আপনি সমর্থন করেন? নিজের বক্তব্য গুছিয়ে লিখুন।

১. 'চোরে চুরি করে ..... সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর॥ বিড়াল কমলাকান্তের দুধ চুরি করে খেয়েছে। সেজন্য কমলাকান্ত তাকে লাঠি দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। বিড়াল তাতে ভয় না পেয়ে 'মেও' বলে ডাকে। যেন প্রশ্ন, কেন মারবেন কমলাকান্ত? তারপর বিড়াল দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তি দেখায়, কেন সে চোর হয়েছে। চোর দরিদ্র। তার ঘরে খাবার থাকে না। কিন্তু পেটে থাকে খিদে। ধনীর ঘরে প্রচুর খাবার। ফেলে ছড়িয়ে ধনীরা খায়। কখনো দরিদ্রদের জন্য কিছু বিলিয়ে দেয় না। এই সব ধনী কৃপণদের জন্য অসহায় দরিদ্ররা কিছু খেতে পায় না। বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য তারা চুরি করে খায়। অর্থাৎ ধনীরা দরিদ্রদের বাধ্য করে চোর হতে। তাই চোরের শাস্তি না হয়ে যারা চোর সৃষ্টি করে তাদেরই সাজা হওয়া উচিত। কারণ তাঁদের দোষ শতগুণ বেশি।

৩. বিড়ালের মতে মনুষ্যজাতির ..... লিখুন।

উত্তর॥ বিড়াল দরিদ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কমলাকান্তের কাছে ধনী সমাজের 'মনুষ্যজাতির' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা তুলে ধরেছে। যেমন :

ক ধনীরা দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হয় না। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট তারা কোনোদিন বোঝে না। তাদের জন্য কাতর হয় না।

খ. ধনী ব্যক্তিরা ধনীদের খাওয়াতে ভালবাসেন। যাদের ঘরে প্রচুর খাবার তাদেরই ভোজসভায় ডাকেন।

গ. ধনীরা ক্ষুধার্ত দরিদ্রদেরকে ভোজসভায় কোনোদিন ডাকেন না। অবশিষ্ট খাবার ফেলে দেন তবু গরিবদের খেতে দেন না।

ঘ. ধনী ব্যক্তিরা ভোগী। একাই পাঁচশো জনের সম্পদ সঞ্চয় করে। ফলে অনেককে বঞ্চিত করতে হয়। সে জন্য তাঁদের কোনো অপরাধ বোধ হয় না।

ঙ. ধনী ব্যক্তির অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের বাঁচার পথ বন্ধ করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তারা চুরি করে। অর্থাৎ কৃপণ ধনী ছোটো বড়োর ব্যবধান সৃষ্টি করে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করে। তারাই সৃষ্টি করে চোর।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ধনীর প্রতিনিধি হিসেবে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- দরিদ্রের দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতি বলতে বিড়াল কী বোঝাতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
সোশিয়ালিষ্টিক – সমাজতান্ত্রিক; এটি ইংরেজি শব্দ। সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক একটি মতবাদ। **নির্বিঘ্নে** – নিরাপদে। **নৈয়ায়িক** – যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **কস্মিনকালে** – কোন কালে। **সুতার্কিক** – তর্কে পটু। **দণ্ডবিধান** – শাস্তির ব্যবস্থা। **মার্জারী মহাশয়া** – স্ত্রী বিড়ালকে সম্বোধনের জন্য মহাশয় এর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। **উপবাস** – না খেয়ে থাকা। **নসীরাম বাবু** – কোন একজনের নাম। **বিজ্ঞ** – জ্ঞানী। **পরাস্ত** – পরাজিত। **প্রথানুসারে** – নিয়ম	আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।" মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?" আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?" বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য। মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে

অনুসারে। **ধর্মাচরণে** – ধর্মের আচার আচরণে। **পাঠার্থে** – পড়ার জন্য। **নিউমান** – বিখ্যাত লেখক। **অসীম** – যার সীমা নেই। **মহিমা** – গুণ। **এক্ষণে** – এখন। **স্বস্থানে** – নিজের জায়গায়। **জলযোগ** – হালকা খাবার বা নাশতা। **অধীর** – অধৈর্য। **পুনর্বার**– আবার। **সরিষা ভোর** – সর্ষে দানার সমান। **ক্ষুধানুসারে** – কেমন খিদে লাগে তা বিবেচনা করে। **পতিত আত্মা** – দুর্দশায় পড়েছে এমন আত্মা এখানে কথাটা বিড়ালকে বলা হয়েছে।	নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।" বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে–আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।" মার্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।" মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

সার–সংক্ষেপ

বিড়ালের মতো এক নগণ্য প্রাণীর কথা শুনতে শুনতে কমলাকান্ত অধৈর্য হলেন। কারণ বিড়াল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের কথা বলছে। যে মতবাদে ধনী এবং নির্ধন সমান। কমলাকান্তের যুক্তি হলো ধনী যদি ধন সঞ্চয় না করে তাহলে সমাজের উন্নতি হবে না। আর বিড়াল মনে করে নির্ধন যদি খেতেই না পায় তাহলে সমাজের উন্নতিতে তার লাভ কী? বিড়াল বলেছে যে, চোরকে শাস্তি দেয়ার আগে একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। সেটা হলো, বিচারককে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবেই তিনি শাস্তি দিতে পারবেন চোরকে। কমলাকান্ত বিড়ালের সঙ্গে তর্কে না পেরে উপদেশ দিতে চাইলেন। বিড়ালকে ধর্মকর্মে মন দিতে বললেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু বইও দিতে চাইলেন পড়ার জন্য। অবশেষে খাবারের ভাগ দিবেন বলে তার্কিক বিড়ালকে চলে যেতে বললেন। খুব খিদে পেলে সর্ষে পরিমাণ আফিম দিতেও চাইলেন। আপোসের কথা শুনে একটু খুশি হয়ে বিদায় নিলো বিড়াল। কমলাকান্ত বিড়ালকে জ্ঞান দিতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন : কমলাকান্ত 'সোশিয়ালিষ্টিক' ..... লিখুন।

উত্তর॥ 'বিড়াল' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ধনী সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর মতে ধনীরা ধন সঞ্চয় করবেন এবং নিরাপদে তা ভোগ করবেন। যদি তা না হয় তাহলে হয়তো কেউ ধন সঞ্চয় করবেন না। অথচ ধন ছাড়া সমাজের উন্নতি কোনেদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু 'সোশিয়ালিষ্টিক' বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ধন সঞ্চয়ের কোনো নিয়ম নেই। এ মতবাদে দেশের ধনী নির্ধন সকলেই সমান। তাতেই বরং সমাজের বিশৃঙ্খলা বাড়বে। গরিবেরা তখন অনায়াসে ধনীর অর্থ ভোগের জন্য দাবি করতে পারবে। কমলাকান্তের বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের এ নীতি ধনী সম্প্রদায়ের জন্য শুভ হবে না। আর ঠিক এ কারণেই অর্থাৎ দরিদ্রের জন্য ধন সঞ্চয়ের চেষ্টাই বাদ দিবেন ধনীরা।

'চোরকে ফাঁসি দাও ..... লিখুন।

উত্তর॥ বিড়াল' প্রবন্ধে দুধ চুরি করে খাওয়ার জন্য কমলাকান্ত বিড়ালকে শাস্তি দিতে চাইলে সে কথাগুলো বলে। বিড়াল কেন চুরি করে খেয়েছে তার বহু কারণ দেখিয়েছে। অবশেষে সে একটা নিয়মের প্রস্তাব দেয় কমলাকান্তকে। তার মতে চোরকে শাস্তি দিতে চাইলে বিচারকের উচিত হবে চোরের সত্যিকার অবস্থা বোঝার জন্য তিনদিন না খেয়ে থাকা। তাহলে খিদের জ্বালায় যে কী কষ্ট হয় তা বিচারক বুঝতে পারবেন। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না হয় তাহলে বিড়াল মাথা পেতে শাস্তি নিবে। বিড়ালের তর্ক এবং নিয়মের কথাটা ভাবিয়ে তুললো কমলাকান্ত কে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'বিড়াল' প্রবন্ধে হালকা কথাবার্তায় গল্পের ছলে লেখক কী বলতে চেয়েছেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

২. ''এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন''? একথা কে বলেছে এবং কাকে বলেছে, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন :

ক) তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ'

খ) 'ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়'

গ) 'সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও'

ঘ) 'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলেও না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।

৪. টীকা লিখুন।

নেপোলিয়ন, ওয়াটার্লু, সোশিয়ালিষ্টিক, শিরোমনি, মার্জারী মহাশয়া।

বিড়াল প্রবন্ধে হালকা ..... ভাষায় লিখুন

উত্তর : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রম্য রচনা গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে 'বিড়াল' প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথাবার্তায় কিছু তামাসার খোরাক আছে। বিশেষ করে দুধচোর বিড়াল যখন পণ্ডিতের মতো কথা বলে, তর্ক করে এবং মানব চরিত্রের দোষগুণের কথা বলতে থাকে তখন পাঠকের হাসি পেতে পারে। বিড়ালের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তামাসা মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। তামাসার ছলে লেখক গভীর দর্শনের কথাগুলোই খোলামেলাভাবে বলেছেন। এটাই রম্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'বিড়াল' প্রবন্ধে মাত্র দুটি চরিত্র। কমলাকান্ত ও বিড়াল। কমলাকান্ত ধনী সমাজের প্রতিনিধি। আর দরিদ্র অসহায় সমাজের প্রতিনিধি হলো বিড়াল। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, দুজনের কথাবার্তায় সমাজের সেই বাস্তব চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমাজে ধনীদের অনেক আছে। তারা পাঁচশো জনের সম্পদ একাই সংগ্রহ করেন এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোগ করেন তা। আর তাঁদেরই আশে পাশে যে দরিদ্র জনসাধারণ থাকে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা ধনীরা ভাবেন না। দেখা যায় ভোজসভায় যে খাবার বেঁচে যায়, তা ফেলে দেয়া হয়। তবু দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয় না। এছাড়াও যাদের ঘরে খাবারের অভাব নেই, ধনীরা তাদেরই ডাকেন ভোজসভায়। দরিদ্র রুগ্ন অনাহারে দুর্বল ব্যক্তিদের খেতে ডাকেন না কোনো ধনী। ফলে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর ঘরে চুরি পর্যন্ত করে। তখন তাকে সবাই বলে চোর। কিন্তু কেন যে সে চুরি করলো, কেন চোর হলো, সে কারণ কেউ খুঁজতে যান না। চোরকে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেন। বিড়ালের সুখ দিয়ে লেখক সমাজ জীবনের এ সত্য কথাগুলো বলিয়েছেন।

বিড়াল কমলাকান্তকে আরো বলে যে, ধনীরাই সমাজে চোর সৃষ্টি করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো দেশের ধন সম্পদে ধনী ও গরিবের যদি সমান অধিকার থাকতো, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হত না। কিন্তু কমলাকান্তের মতে, ধনীরা সম্পদ সংগ্রহ করে বলেই সমাজের উন্নতি হয়। বিড়াল এ কথা মানতে চায় না। তার মতে, গরিবরা যদি খেতে পরতে না পায়, তাহলে সমাজের উন্নতি হলেই কী আর না হলেই কী। পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র জন সাধারণের পক্ষ থেকে বিড়াল যখন এ কথাগুলো বলে তখন পাঠকদেরও ভাবিয়ে তোলে তা। বিড়াল আরও বলে যে ক্ষীর সর দুধ দই মাছ মাংস শুধু কি ধনীরাই খাবেন? গরিবরা খেতে পাবে না কেন? তখন মনে হয়, কোনো গরিব ক্ষুধার্ত অসহায় লোক সাহসের সঙ্গে প্রশ্নগুলো করছে ধনী সম্প্রদায়ের কাছে।

বিড়াল যখন প্রতিবাদ করে বলে, দুধ চুরি করে খেয়েছি বলে দণ্ড দিবে কেন? বিচারককে তিনদিন না খেয়ে খিদের জ্বালা অনুভব করতে বলে সে। তার মতে গরিবের দুঃখ না বুঝে বিচার করলে তা ন্যায্য বিচার হয় না। সমাজের গরিব সম্প্রদায় এমন করেই বলে থাকে। প্রকৃত পক্ষে গরিবের প্রতিবাদ ও যুক্তির কাছে ধনীরা যখন হেরে যান তখন তাঁরা নানা রকম নীতিকথা এবং ধর্মকথার উপদেশ দেন। কমলাকান্তও তাই করেছেন। তর্কে হেরে গিয়ে বিড়ালকে তিনি ধর্মকর্মে মন দিতে বলেন। নীতি নিয়ম মেনে চলতে বলেন।

তবে কমলাকান্ত জ্ঞানী। সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির কারণ তিনি বোঝেন। তাই অবশেষে বিড়ালের সঙ্গে আপোসের কথা বলেন। ছানা ভাগ করে খাওয়ার আশ্বাস দেন বিড়ালকে। আফিমের মতো দামী নেশার জিনিসও একটু দিতে চান। সত্য মিথ্যে যাই হোক, আশ্বাস পেয়ে বিড়াল চলে যায়। এতে কমলাকান্ত খুশি হন। কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে গরিবরা বিদায় হলে ধনীরা যেমন খুশি হয়- ঠিক তেমনি।

বিড়াল প্রবন্ধে আমরা একদিকে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাই, অন্যদিকে পাই লেখকের অসাধারণ রসবোধের পরিচয়। অতি সাধারণ ঘটনার রূপকে তিনি সমাজের কঠিন সত্যগুলো উচ্চারণ করেছেন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

'তেলা মাথায় ---------- রোগ'।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধ থেকে বাক্যটি নেয়া হয়েছে। দুধ চুরি করে খাওয়া নিয়ে কমলাকান্ত ও বিড়ালের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তারই এক পর্যায়ে বিড়াল উক্তিটি উচ্চারণ করে।

এ রম্য রচনায় বিড়াল দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ধনী সমাজের প্রতিনিধি কমলাকান্তকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা শুনিয়েছে। বিড়ালের যুক্তি হলো, তার খিদে পেয়েছিল, কেউ তাকে ডেকে খেতে দেয় না এবং দিবেও না। তাই সে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চুরি করেছে। তার বিচারে এটা দোষ নয়। বরং ধনীরা যে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে রাখে, কখনো যথেষ্ট অপচয়ও করে, যার ফলে গরিবরা খেতে পায় না, সেটাই ধনীদের অপরাধ। ধনীরা কোনদিন

দরিদ্র এবং ক্ষুধার্তদের দুঃখ কষ্ট বোঝে না। তাদের সম্মান করা তো দূরের কথা। অথচ ধনীর ঘরে কোনো জ্ঞানী-গুণী কিংবা ধনী লোক খেতে আসলে তাঁদের আদরের অন্ত থাকে না। কমলাকান্তের দুধটুকু যদি ওঁদের কেউ খেতেন তাহলে তিনি খুশিই হতেন। আরও একটু দিতে চাইতেন। অথচ ক্ষুধার্ত অসহায় বিড়াল দুধটুকু খেয়েছে বলে তাকে লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছেন কমলাকান্ত। মানুষের এমন আচরণ দেখেই বিড়ালের মনে হয়েছে, তেলা মাথায় তেল দেয়াই মানুষের স্বভাব। কথাটা কঠিন হলেও সত্য।

'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের ..... দণ্ডবিধান কর্তব্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধ থেকে লাইনগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কমলাকান্তের উক্তি।

কমলাকান্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, ধনীরা ধন সঞ্চয় করে বলেই সমাজের উন্নতি হয়। স্কুল কলেজ, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিড়ালের মত হল, সমাজের উন্নতি মানেই ধনীর ধনবৃদ্ধি। এমন সামাজিক উন্নতিতে গরিবের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিড়ালের দৃঢ় বিশ্বাস, গরিবরা যদি খেতে না পায়, যদি তাদের দুঃখ কষ্ট না কমে, তাহলে সমাজের উন্নতি হওয়া না হওয়ায় গরিবের কিছু যায় আসে না। ক্ষিদে পেলে বাঁচার জন্য চুরি করেই খেতে হবে তাদের। বিকল্প নেই। কমলাকান্ত বিড়ালের এমন যুক্তি কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। তাঁর বিচার মতে গরিবের কী হলো না হলো সে কথা ভাবার চেয়ে সমাজের উন্নতির কথা ভাবাই বেশি প্রয়োজন। আর সে কারণেই সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুব জরুরী। শাস্তিরও বিধান থাকতে হবে চোরের জন্য। কী কারণে চোর চুরি করে সে কথা না ভাবলে চলতে পারে কিন্তু চোরের দণ্ডের কথা সমাজকে ভাবতেই হবে। কমলাকন্তের কথায় এখানে ধনী এবং দরিদ্রের মন মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

৪. টীকা লিখুন

উত্তর : পাঠ ১, ২ ও ৩ এর শব্দার্থ ও টীকা অংশে দেখুন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. দশটি যৌগিক শব্দ বিশ্লেষণ করুন।
২. দশটি সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়াকে চলিত ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ায় রূপান্তর করুন।
৩. পাঠ থেকে সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ (একবচন ও বহুবচনের) বের করে লিখুন।
৪. শর্তবাচক অব্যয় ব্যবহার করে পাঠ থেকে পাঁচটি যৌগিক বাক্য বেছে নিয়ে লিখুন (প্রয়োজনে বাক্য সংক্ষেপ করতে পারেন)।
৫. এ পাঠে কী কী বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, নাম উল্লেখ করে তার পাঁচটি নমুনা দিন।
৬. বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এক পদের ব্যবহার করুন : যেমন- মন, হস্ত, ভগ্ন, দণ্ড, ইত্যাদি।
৭. দশটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন : যেমন- মন, জ্ঞান, কারণ, প্রহার, ধর্ম, প্রশংসা, শিক্ষা, সুখ, আহার, সমাজ।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. দশটি যৌগিক শব্দের বিশ্লেষণ :

আহারাভাবে	:	আহার+অভাব+এ
নির্দয়তায়	:	নির+দয়া+তা+য়
সমাজবিশৃঙ্খলার	:	সমাজ+বি+শৃঙ্খলা+র
নির্বিঘ্নে	:	নির+বিঘ্ন+এ
মনুষ্যজাতির	:	মনুষ্য+জাতি+র

[*বাকি পাঁচটি শব্দ বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ করুন*]

২. দশটি সাধুরীতির যৌগিক ক্রিয়ার চলিত রূপান্তর :

ঝুলিয়া পড়িয়াছে	ঝুলে পড়েছে
ঠেঙ্গাইয়া মারিও	ঠেঙ্গিয়ে মেরো
খাইয়া ফেলে	খেয়ে ফেলে
হইতে পারিল	হতে পারলো
করিয়া বলিলাম	করে বললাম

৩. শর্তবাচক অব্যয় ব্যবহার করে পাঁচটি যৌগিক বাক্য :

ক. যদি কেহ সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল তবেই তাহার পুষ্টি।

খ. তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে গ্রন্থ দিতে পারি।

গ. যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন উপদেশ প্রদান করিবে।

ঘ. চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণও শতগুণে দোষী।

ঙ. যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে পারে।

৪. বাক্যে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন :

ক. কমা – অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল, বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে।

খ. প্রশ্নবোধক চিহ্ন – কৃপণের দণ্ড হয় না কেন?

গ. উদ্ধৃতি চিহ্ন – 'মেও' বিড়াল ডাকিল।

ঘ. অবাক/আবেগ চিহ্ন – ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছি!

ঙ. ড্যাশ – আমাদিগের দশা দেখো – আহারাভাবে উদর কৃশ।

চ. সেমিকোলন – চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

পাঠ থেকে একটি অনুচ্ছেদ বেছে নিয়ে পড়ুন এবং তার বিরাম চিহ্নগুলো দেখুন। তারপর বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য রচনা করুন।

৭. বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এক পদের ব্যবহার :

ক. মন : বন্ধু কাল বিদেশ যাবে তাই আমার মন খারাপ (মন)
আমার সুখে তার মন খারাপ হয় (হিংসা)
পড়ায় তার মন নেই (মনোযোগ)

খ. দণ্ড : তোমার হাতে বাঁশের দণ্ড কেন (লাঠি)
দুধ চুরির জন্য বিড়ালকে দণ্ড দিতে চাই (শাস্তি)

আর এক দণ্ড দেরি করতে পারবনা (সময়)

[*বাকি দুটি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করুন*]

৮. বিশেষ্য পদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মন	মানসিক	প্রশংসা	প্রশংসিত
জ্ঞান	জ্ঞানী	শিক্ষা	শিক্ষিত
কারণ	কারণিক	সুখ	সুখী
প্রহার	প্রহৃত	আহার	আহার্য
ধর্ম	ধার্মিক	সমাজ	সামাজিক

সৃজনশীল কাজ

১. তেলা মাথায় তেল দেয়া; কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করতে শিখুন। আপনার জানা পাঁচটি প্রবাদ লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন–

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি পড়ুন। সম্ভব হলে লেখকের কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসও পড়ুন।

কারবালার পর

মীর মোশাররফ হোসেন

লেখক পরিচিতি

কুষ্টিয়া জেলার (তৎকালীন নদীয়া) গৌরী নদীর তীরে লাহিনীপাড়া গ্রামে এক সৈয়দ পরিবারে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তাঁর আগে বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলমান সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় না। মীর মশাররফ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। জমিদার কাচারীর ম্যানেজার হিসেবে তিনি কলিকাতা, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, ফরিদপুরের পদমদী এবং তাঁর জন্মভূমি কুষ্টিয়াতেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। লেখকের প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রসরচনা, নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে প্রায় ৩৫টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল আকর্ষণ। বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রতি মুসলিম সমাজকে পথ দেখিয়েছেন তিনি। এ জন্যও তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। মীর মশাররফ হোসেন মূলত সাধুরীতির গদ্যে লিখতেন। তাঁর ভাষা গড়ে নিতেন। ফলে তাঁর রচনায় যেমন প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে তেমনি আছে আঞ্চলিক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ। লেখকের প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী', প্রকাশ কাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু'। তিন পর্বে ১৮৮৫, ১৮৮৭ এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থের নাম :

উপন্যাস : উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯১)।

নাটক : বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)

কাব্য : সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭)

আত্মচরিত : আমার জীবনী (১৯০৮)।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভূমিকা

'কারবালার পর' গদ্যাংশটুকু 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এ অংশে আছে, কারবালার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এজিদের নির্দেশে সীমার ইমাম হোসেনের মাথা কেটে বর্শায় বিদ্ধ করে দামেস্কে নিয়ে যাচ্ছেন তার করুণ বিবরণ। এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে সীমার যে পাশবিক কাজ করেছে, সে জন্য বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাত্র হয়েছে সে। এ গদ্যাংশের মধ্যেই আছে গৃহস্থ আজরের মতো মহান ব্যক্তির বর্ণনা। হোসেনের পবিত্র মাথার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে একে একে তিন পুত্রের মাথা কেটে সীমারের হাতে দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। অবশেষে সীমারের বর্শার আঘাতে আজর নিহত হয়েছেন। এদিকে আজরের তুলনাহীন আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনায় লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের অমর এবং জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে আজও বিখ্যাত।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক মুসলিম গদ্যলেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।
২. মীর মশাররফ হোসেনের অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে আংশিক ধারণা লাভ করবেন।
৩. লেখকের ভাষারীতি, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সীমারের পাষাণ-হৃদয় চরিত্রের বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- অর্থলোভ মানুষকে কতো অমানুষ করে তুলতে পারে, তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
ত্রস্তে – বেগে। **মোহিত** – মুগ্ধ। **দৌড়িতেছ** – দৌড়াচ্ছো। **স্বার্থ** – নিজের লাভ। **পাতকী** – পাপী। **বিনাশ** – ধ্বংস। **কলহ** – ঝগড়া। **বৈরীভাব** – শত্রুভাব। **বিসর্জন** – ত্যাগ। **অকাতরে** – কাতর নয় এমন। **অগাধ** – অথৈ, অতি গভীর। **কুহক** – মায়া, **সমাগত** – প্রায় আগত। **অবিশ্রান্ত** – অক্লান্ত, অনবরত। **দিনমনি** – সূর্য। **আশু** – তাড়াতাড়ি। **নিশা** – রাত। **বিদ্ধ** – গাঁথা। **রোষ** – রাগ। **মোচন** – মুক্তিদান। **শিহরিয়া** – কেঁপে ওঠা, শিউরে ওঠা।	রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌঁড়িতেছে? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি ? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? তুমি ত আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না? জয়নাব এমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এত বেগে দৌঁড়িতেছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি? অর্থ ? হায় রে অর্থ! হায় রে পাতকী অর্থ। তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নিতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন বিনাশ- এ সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত-মহাব্যস্ত প্রাণ ওষ্ঠাগত! তোমারই জন্য কেবলমাত্র তোমারই কারণে- কতজনে তীর, তরবারি, বন্দুক, বর্শা, গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্বত শিখরে আরোহণ করিতেছে। রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর। তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া!! কি মোহিনী শক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও! কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও! কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও। তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমার হস্তে খণ্ডিত! –রাক্ষসি। তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ। সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব; তন্মধ্যে অর্থ-চিন্তাই প্রবল, চির অভাবগুলি আশু মোচন করাই

	স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত- যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এ ত সকলই মহারাজ এজিদ নামদারের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অন্তর্গত। সৈনিক বেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে? কার সাধ্য কে কি করিবে?

সার-সংক্ষেপ

লেখক এখানে বলেছেন যে হোসেনের শিরে সীমারের প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন লক্ষ টাকা। সেই লোভে এতো বড়ো পাপের কাজ সে করেছে। টাকার লোভ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি তো দিতেই পারে না, দেয় শুধু অশান্তি। পৃথিবীর সমস্ত অনর্থ কাজের মুলে আছে অর্থলোভ। এ লোভকে লেখক তাই ঘৃণার চোখে দেখেছেন। অর্থলোভকে তুলনা করেছেন বিষের সঙ্গে। এ বিষের আকর্ষণে মানুষ হয়ে যায় পাষণ্ড, নিষ্ঠুর ও অমানুষ।

লেখক কল্পনায় অর্থলোভী সীমারের সঙ্গে কথা বলছেন। অর্থের লোভে মানুষ কেমন অমানুষ হয় সে কথা বলছেন। অর্থের জন্য মানুষ বিবেক বুদ্ধি মায়া মমতা বন্ধুত্ব প্রেম ভক্তি সবই বিসর্জন দিতে পারে। তাই অর্থকে লেখক বলেছেন সব অনর্থের মূল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এ পাঠে লেখা নতুন শব্দগুলো নিজের খাতায় লিখুন।

২. অর্থের লোভ মানুষের কি কি ক্ষতি করে, কমপক্ষে পাঁচটি ক্ষতির কথা নিজের খাতায় লিখুন।

৩. ইমাম হোসেনের কাটা মাথা সীমারের বর্শায় গাঁথা– এ দৃশ্য কল্পনা করে ৬/৭টি বাক্যটি লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : অর্থ মানুষের কী কী ক্ষতি করে, কম পক্ষে ছয়টি ক্ষতির কথা লিখুন।

উত্তর ॥ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে প্রয়োজনে অর্থ মানুষকে খারাপ কাজ এবং অমঙ্গলের নেশার দিকে টানে। তাই প্রবাদ আছে যে অর্থই অনর্থের মূল। সে অনর্থগুলো পরিবারে ও সমাজে নানা ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন :

ক. অর্থের লোভ মানুষকে লোভী করে তোলে।

খ. অর্থের লোভ মানুষকে হিংসাপরায়ণ করে তোলে।

গ. অর্থের জন্য মানুষের বিচার বুদ্ধি লোপ পেতে পারে।

ঘ. অর্থের জন্য মানুষের সুস্থ বিবেক মরে যেতে পারে।

ঙ. অর্থের লোভে মানুষের বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি–

- মদিনার রাজা হোসেনের পরিচয় জানতে এবং লিখতে পারবেন।
- গৃহস্বামী আজরের অতিথি সেবার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
নিশাযাপন – রাত কাটানো। **সাদরে** – আদরের সঙ্গে। **পথশ্রান্তি** – পথের ক্লান্তি বা অবসাদ। **আহার্য** – খাবার জিনিস। **শির** – মাথা। **পরাস্ত** – পরাজিত। **পৌত্তলিক** – যে পুতুল পূজা করে। **একেশ্বরবাদী** – এক ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে। **উপাস্য** – উপাসনার যোগ্য। **অজ্ঞাতে** – অজান্তে। **তত্ত্বাবধানে** – দেখা শোনাতে। **দ্বিরুক্তি** – দ্বিতীয় বার কথা বলা। **শ্রবণ মাত্রই** –শোনা মাত্রই। **সম্মত** – রাজী হওয়া। **আশ্রম** – বাসস্থান। **শয়ন** – শোয়া। **বিলম্ব** – দেরি। **অচেতন** – চেতনা শূন্য। **বাস্তবিক** – সত্য। **আরাধনা** – উপাসনা। **রত** – নিযুক্ত। **প্রত্যূষ** – সকাল। **ভক্তি সহকারে** – ভক্তির সঙ্গে। **বিনীত ভাবে** – বিনয়ের সঙ্গে। **অভ্যর্থনা** – আপ্যায়ন।	সীমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশাযাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত- বুঝি, রাজসংক্রান্ত কেহ বা হয় মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা, বলিলেন না। সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহার্য দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তি সহকারে অতিথিসেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।" সীমার বলিল– "কি কথা?" "কথা কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এ বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের?" ইহার অনেক কথা তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাঁহার পিতা আলী এবং মুহাম্মদের কন্যা ফতেমা যাঁহার জননী, এ তাঁহারই শির। কারবালা প্রান্তরে মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্য সহিত পরাস্ত হইয়া এ অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি; পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মুহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।" "হ্যাঁ, এতক্ষণে জানিলাম আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ, যদি কোন শত্রুআপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ সময়ে কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এ মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এ মহামূল্য শির – আপাতত যাহার মূল্য লক্ষ টাকা– যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে। আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যূষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।" সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়ন বিলম্ব, যেমনই শয়ন, অমনই অচেতন। গৃহস্বামী বাস্তবিক হয়রত মুহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী। নাম 'আজর'।

সার-সংক্ষেপ

ক্লান্ত সীমার রাত কাটানোর জন্য এক গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হলো। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পোশাক দেখে গৃহস্বামী তাকে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। পরে অতিথিকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে বর্শার আগায় গাঁথা ঐ কাটা মাথাটি হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্র এবং হযরত মুহাম্মদের অতি প্রিয় নাতি ইমাম হোসেনের। এই কাটা মাথা দেখাতে পারলে এজিদ তাকে এক লক্ষ টাকা পুরষ্কার দিবে। সীমার বললো যে আজর পৌত্তলিক বলেই তার বাড়িতে সে অতিথি হয়েছে। আজর সত্যিই দেবদেবীর পূজা করতেন। এক ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। হযরত মুহাম্মদের শিষ্যও ছিলেন না তিনি। আজর অতিথিকে নিশ্চিত মনে বিশ্রাম নিতে বললেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন (আজরের ধর্ম, তাঁর অতিথি সেবা, তাঁর মধুর ব্যবহার এবং পরিবারের কথা গুছিয়ে নিবেন প্রথমে)।

২. শব্দার্থগুলো কয়েকবার পড়ে ৫টি শব্দ বেছে নিয়ে নিজের ভাষায় বাক্য লিখুন।

৩. আজরের কী কী কথা শুনে সীমার নিশ্চিন্ত মনে ইমাম হোসেনের মাথা তার কাছে রাখতে রাজি হলো, তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. পাঠ থেকে ৫টি বাক্য বেছে নিয়ে তা চলিত ভাষায় লিখুন। যেমন :
ইহার অনেক কথা তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (সাধু ভাষা)
এর অনেক কথা তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। (চলিত ভাষা)

নমুনা উত্তর

৩. আজরের কী কী কথা শুনে সীমার নিশ্চিন্ত মনে ইমাম হোসেনের মাথা তার কাছে রাখতে রাজি হলো?

উত্তরঃ সীমারের কাছ থেকে আজর শুনেছেন যে ইমাম হোসেনের ছিন্ন শিরের দাম লক্ষ টাকা। এতো বড়ো সম্পদ নিয়ে রাত জাগাও বিপদ, ঘুমালেও বিপদ। সে কথা সীমার যেমন জানে আজরও তেমনি বুঝেছিলেন। তাই অতিথিকে তাঁর কাছে মাথাটা গচ্ছিত রাখতে বলেছিলেন। তাহলে :

ক) ক্লান্ত সীমার ঘুমিয়ে পড়লেও কেউ লক্ষ টাকা মূল্যের এ ছিন্ন শির নিয়ে যেতে পারবেনা।
খ) রাত্রে কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে মহামূল্য শির কেড়ে নিতে পারবে না।
গ) কোনো শত্রুযদি সীমারকে অনুসরণ করেও থাকে, সে এ ছিন্ন শির খুঁজেই পাবে না।
ঘ) আজর নিজের তত্ত্বাবধানে ছিন্ন শির রাখার আশ্বাস দিলেন।
ঙ) সকালে সীমারের হাতে ছিন্ন শির তুলে দিবেন বলে আজরকে আশ্বস্ত করলেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হোসেনের ছিন্নশির দেখে পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও আজর ও তার পরিবারের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ননা লিখতে পারবেন।
- কী কী বাক্য উচ্চারণ করে আজর বিলাপ করেছিলো তার কয়েকটি বাক্য নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- হোসেনের ছিন্ন মাথা নিয়ে আজর কী করতে চেয়েছিলো তা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ

আদ্যন্ত – আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।
সমুদয় – সমস্ত।
নিদারুণ – অতি কঠোর, একান্ত অসহ্য।
লীলা – খেলা।
দ্বেষ – হিংসা।
মূঢ়তা – মূর্খতা।
তন্ত্রী – তার
বিভেদ – পার্থক্য।
চক্ষু – চোখ।
অবমাননা – অপমান।
রোষাগ্নি – ক্রোধের আগুন।
নির্বাপিত – নিভে গেছে এমন।
অনন্তধাম – চিরস্থায়ী গৃহ অর্থাৎ মৃত্যুর জগৎ।
ঋষি – সাধু।
অনন্ত – চিরস্থায়ী।
বশবর্তী – অধীন।
অমানুষিক – মানুষের অসাধ্য।
কীর্তি – বিশেষ ভালো কাজ।
হত – হত্যা করা হয়েছে এমন।
ইয়ত্তা – হিসাব।
প্রস্তর – পাথর।
বিপরীত – উল্টা।
সদগতি – মৃতের শেষ কাজ।

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া, আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন- শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষমাত্রই এক উপকরণে গঠিত এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সেও সর্বশক্তিমানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হউক আর না হউক, জাতি ও জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্মিক, বিশেষ ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ মুহাম্মদের হৃদয়ের অংশ – ইহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায় – বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্মই হউক না কেন, উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে, তৎকার্যে যোগ দিতে কে বারণ করিবে? মহাপুরুষ মুহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছেন বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য ? জগৎ কয় দিনের? এজিদ। তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস? জীবনশূন্য দেহের সদ্‌গতির সংবাদ শুনিয়া কি তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাপিত হইত না? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনিয়া মিটিত না? হোসেন-পরিবারের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া, অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে! – তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস না। তোকে কোন ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভে বশবর্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখ হইতে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন কতকাল ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণ হরণ করিয়াছিস, কিন্তু তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর একি ভাব? রক্ত-মাংস-বীর্য-গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব শরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাহা যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা – জীবন থাকিতে হোসেন - শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদগতির উপায় করিবে, প্রাণ থাকিতে আজর এ শির ছাড়িবে না!"

সার-সংক্ষেপ

সীমার ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী পুত্রের কাছে আজর সমস্ত ঘটনা বললেন। হোসেনের ছিন্ন শির দেখে শোকে অধীর হয়ে সবাই কাঁদতে লাগলেন যে সব মানুষই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। তবু তাদের মধ্যে এতো হিংসা এতো ঘৃণা কেন? যে যার ধর্ম পালন করবে তাতে বাধা দেয়ার তো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া হোসেন হলেন-সাধু, পরম ধার্মিক মহাপুরুষ মুহাম্মদের বংশধর। পবিত্র বংশের পবিত্র সন্তান। সেই পবিত্র মাথা কেটে বর্শায় বিদ্ধ করেছে সীমার। এজিদের জন্যই সীমার অকালে হোসেনকে হত্যা করেছে। আজর প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবন থাকতে এই ছিন্ন শির সীমারকে দিবেন না। কারবালায় গিয়ে হোসেনের দেহ খুঁজে নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সৎকার করবেন।

পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরষ মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি আজরের ভক্তি ছিল। হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের পরিবার শোকে দুঃখে কাতর হলো। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই ছিন্ন শির কিছুতেই সীমারকে দিবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের শোকের কারণ কী, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২. ধর্মের বিভেদ থাকলেই মানুষের প্রতি মানুষ পশুর মতো আচরণ করবে বলে আপনি মনে করেন কি? কমপক্ষে ৭/৮টি বাক্যে আপনার মত যুক্তি দিয়ে লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে আজরের শোকের কারণ কী?

উত্তর ॥ ইমাম হোসেন হলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) প্রাণপ্রিয় নাতি, জগৎ-জননী মা ফাতিমার আদরের সন্তান এই মহাপুরুষ জীবিত থাকলে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে পারতেন। ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা প্রচার করতে পারতেন। তাঁর এমন করুণ মৃত্যুতে তাই–

ক) পশু পাখির চোখে অশ্রু ঝরছে,
খ) প্রকৃতির অন্তর ফেটে যাচ্ছে,
গ) ছিন্ন মস্তক দেখে মানুষ ব্যথিত হয়েছে,
ঘ) এমাম হোসেনের মৃত্যু সংবাদ যে শুনেছে সেই শোক প্রকাশ করেছে।

এতো বড়ো মহৎ প্রাণের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে তাই পৌত্তলিক আজরও কান্না রোধ করতে পারেন নি। মায়া মমতা দিয়ে গড়া কোনো মানুষই ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে না কেঁদে পারে না। আজর একজন সৎ ও বিবেকবান মানুষ। মানুষের জন্য মানুষই কাঁদে। আজরের কান্নায় তার মানবতা ও মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

২. এজিদকে উদ্দেশ্য করে আজর কী বলেছিলেন?

উত্তর॥ এমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে শোকে দুঃখে আজর বলেছিলেন- লোভেই সীমার এমন জঘন্য নিষ্ঠুর কাজটা করেছে। এজিদের নাম ধরে উচ্চারণ করলেন যে, এ কি জগতে অম্র? এমাম হোসেন নিহত হয়েছেন এ খবর শুনেই তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নিভে যেতে পারত না কি? এমাম হোসেনের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজনের যে আহাজারি, যে বুক ফাটানো কান্না, যে সীমাহীন শোকের ধ্বনি উঠেছে তাতে ঈশ্বরের আসন পর্যন্ত টলে উঠছে। কিন্তু এজিদের হৃদয় এতই পাষাণ যে মৃতদেহের প্রতিও সে শত্রুতা পোষণ করেছে। ঈশ্বর তাকে কোন বস্তু দিয়ে গড়েছেন যে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই? সামান্য লোভের জন্য এজিদ এমন অমানবিক কাজ করলো যে চিরকাল জগতবাসী তাকে ঘৃণা করবে। আর কাঁদবে এমাম হোসেনের জন্য। অসময়ে এজিদ এমাম হোসেনকে হত্যা করেছে। এ কথা মনে হলে পাষাণও গলে যাবে - এমনই বেদনাদায়ক এ নির্মম হত্যা। এজিদ মানুষ নয়। মানুষের কোনো গুণই তার মধ্যে নেই। সে পাষণ্ড, নরপশু।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সত্যিকার মানুষ হলে তার মধ্যে যে দয়া মায়া সহানুভূতি থাকে এবং পরের দুঃখে তখন সে কেমন কাতর হয় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- আজর সীমারকে পশু ও সভ্য মানুষের আচরণগত পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছিল, নিজের ভাষায় তা গুছিয়ে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
অঞ্চল – আঁচল। **নিধি** – গচ্ছিত ধন। **পণ** – প্রতিজ্ঞা। **প্রত্যার্পণ** – ফেরত দেয়া। **প্রাতে** – সকালে। **উৎসর্গ** – স্বত্বত্যাগ, দান। **পরোপকার** – পরের উপকার। **ব্রত** – তপস্যা, সংযম। **অতিবাহিত** – পার করে, কাটিয়ে যেতে। **রজনী** – রাত। **লোমহর্ষক** – গায়ে কাঁটা দেয় এমন ভয়ের কথা। **জগৎলোচন** – পৃথিবীর চোখ। **রবিদেব** – সূর্য। **অন্তর্ধান** – অদৃশ্য হওয়া। **কল্য** – কাল। **নিঃস্বার্থ** – স্বার্থছাড়া। **প্রণয়ী** – প্রেমিক। **দৃষ্টান্ত** – উদাহরণ। **জায়া** – স্ত্রী। **পরিজন** – পরিবারের লোক। **অবিনশ্বর** – যা অমর। **লোহিত** – লাল। **পরিশোভিত** – সুন্দর সাজে সজ্জিত। **বিলম্ব** – দেরি। **রক্ষিত** – রাখা আছে। **বহির্ভাগে** – বাইরে। **গতজীবন** – জীবনহীন। **দণ্ডায়মান** – দাঁড়ানো। **শীঘ্র** – তাড়াতাড়ি। **ভ্রাতঃ** – ভাই।	পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ; তথাপি কিছুতেই সৈনিক হস্তে এ শির প্রত্যার্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।" পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন, "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর-ভক্তের মন এক, আত্মএক। ধর্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে - রক্তে রক্তে লেশমাত্র যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। পরোপকার ব্রতে জীবনপণ কথাটি শুনিয়াও কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না।" পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগতকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে, জগৎলোচন রবিদেবকে পূর্ব গগন-প্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ কল্য দেখিয়াছে। আজ আবার দেখুক নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক - পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক - সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক। ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-জায়া, পরিজন বিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিয়া থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছ জানে, জীবন থাকিতেই জীবনলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে? মানুষের পরিচয় কি? মহাশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ে ক্ষমতা কি? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি? আজ ভাল করিয়া দেখুক। জগৎ জাগিল। পূর্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল! সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান- এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্ত ক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব!" আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিল, "ভ্রাতঃ, তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন ঈশ্বরের সৃষ্টজীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না; ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গতজীবন শত্রুশরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ, তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন ভাই?"

উচ্চৈঃস্বরে – উঁচু স্বরে।	

সার-সংক্ষেপ

হোসেনের মাথা দামেস্কে নিতে দিবে না বলে আজরের পরিবার একমত হল। সেজন্য যে কোনো ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলো তারা। প্রয়োজনে জীবন দান করবে তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। সারা রাত কেটে গেলো এসব কথা আলোচনা করতে করতে। আজরের পরিবারের লোকজন সত্যিকার অর্থে ধার্মিক। সে ধর্ম মানুষের ধর্ম। মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা হৃদয়ের শক্তিকে, মায়া মমতা বিবেক ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখে। আত্মত্যাগে তাঁদের ভয় থাকে না। মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পারলেই জীবন সার্থক হয় এ তাঁদের বিশ্বাস।

মানুষ আর পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এ যে পশু ভালো-মন্দ বোঝে না, ধর্ম-অধর্ম বোঝে না, পরের জন্য আত্মত্যাগ বোঝে না এবং অবিনশ্বর জীবনের অর্থও তার অজানা। কিন্তু মানুষ ভালো মন্দ বোঝে। পরের জন্য, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে। হৃদয়ের এ শক্তিই মানুষকে অমর করে। প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পাওয়া যায় চরম ত্যাগেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আজরের স্ত্রী ও পুত্রেরা কী আলোচনা করেছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।
২. মানুষ অমর হয় কিসে - ভোগে না ত্যাগে? আপনার বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে লিখুন।
৩. মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কী, আজরের বক্তব্য পড়ে তা নিজের ভাষায় লিখুন।
৪. আজরের স্ত্রী এবং পুত্রদের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো গুণ কী? ত্যাগ সাহস না ভক্তি? অথবা তিনটাই? আপনার মতামত খাতায় লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. আজরের স্ত্রী ও পুত্রেরা কি আলোচনা করেছিলেন তা লিখুন।

উত্তরঃ এমাম হোসেনের ছিন্ন শির এবং কারবালায় লোমহর্ষক যুদ্ধের কথা জানার পর আজরের পরিবারের সকলেই শোকে অধীর হলেন। তাঁরা যদিও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না তবু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে এমাম হোসেন ছিলেন বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতি আদরের নাতি। শত্রুরা ইমাম হোসেনকে বধ করে ধর্ম বিধান মতে মৃতের সৎকার তো করেইনি বরং পবিত্র দেহ থেকে মাথাটা ছিন্ন করেছে। এ পবিত্র ছিন্ন শির তাঁরা কারবালায় নিয়ে যাবেন। ভোর হওয়ার আগেই সকলে চলে যাবেন। ভাগ্যে যা থাকে থাক। এতে যদি জীবন যায় তাতেও আপত্তি নেই। আজরের তিন ছেলেও এ কথায় রাজি। তাঁরাও প্রতিজ্ঞা করলেন- কিছুতেই এ ছিন্নশির সীমারকে ফেরত দিবেন না। এ জন্য তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। ছেলেদের সাহসের কথা শুনে আজর আশ্বস্ত হলেন।

৪. মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ..... লিখুন।

উত্তরঃ আজর সাধারণ গৃহস্থ। তিনি একেশ্বরবাদী নন। মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) শিষ্যও নন। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক বিবেকের ধর্মে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রাণীর মধ্যে যে বিবেক নেই, সেই বিবেকের জন্যই যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী এ কথা তিনি সীমারকে বলতে চেয়েছেন। আজরের মতে ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি বিধি ব্যবস্থা, ইত্যাদির কোথাও এমন কথা পাওয়া যায় না যে শত্রুর মৃত শরীরে নির্যাতন করতে হয়। তিনি আরও বলেন যে বন্য পশু এবং অসভ্য জাত, যারা পশুর তুল্য, তারাই কেবল মৃতের শরীরে লাঞ্ছনা দিয়ে আনন্দ পায়। মানুষের ধর্ম হল মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ করা। সভ্য মানুষের প্রধান গুণ হলো, পরোপকারের কাজে এগিয়ে যাওয়া। পশুরা এসব চিন্তা করতে কিংবা এমন আচরণ করতে পারে না। তাই পশুরা সহজেই হীন নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। মানুষের

সঙ্গে পশুর পার্থক্য এখানেই। সীমার যেহেতু মানুষ, তাই তার কাছে আজরের প্রশ্ন মানুষ হয়েও কেনো সে পশুর আচরণ করছে?

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পশুহৃদয় সীমার টাকাকে কতো মূল্য দিয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- আজরের পুত্র সায়াদের পিতৃভক্তি এবং ত্যাগী চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
প্রদত্ত – দেয়া। **উদর** – পেট। **হিতোপদেশ** – ভাল উপদেশ। **কপট** – প্রতারক। **ধর্মাবতার** – ধর্মের অবতার, বিচারকের প্রতি সম্বোধন। **বাসনা** – ইচ্ছা। **জীবনান্তে** – জীবনের পরে। **রাজদ্রোহী** – রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে। **বিষণ্নভাবে** – দুঃখিতভাবে। **সংকল্প** – প্রতিজ্ঞা। **যাঞ্চা করিয়া** – চেয়ে নিয়ে। **সমর্পণ** – স্বত্বত্যাগ করে দেয়া। **নরহত্যা পাপ পঙ্কিলে** – মানুষ হত্যার মতো খারাপ পাপে। **স্কন্ধোপরি** – কাঁধের উপর। **খড়্গ** – খাঁড়া, তরবারি। **তিলার্ধকাল** – এক মুহূর্ত। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া** – মৃতের সৎকার। **নরাকার পশু** – মানুষের আকারে পশু। **ছেদন** – কেটে ফেলা। **ন্যস্ত** – দেয়া, অর্পণ করা। **দীক্ষিত** – উচ্চ আদর্শের শিক্ষা পাওয়া। **পরিপোষণ** – বিশেষভাবে	"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! এ সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব, বিড়ালতপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী জগতে অনেক আছে- অনেক দেখিয়াছি। আজও দেখিলাম। তোমার ধর্ম-কাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা সমস্ত তুলিয়া রাখ। কারণ, ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাকে না বুঝিবে যে, হোসেন- মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকটে বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।" "ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাতপ্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা, এ সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?" "ওহে ধার্মিকপ্রবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি। টাকা কি জিনিস তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট কথাটির প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে বল ত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই, কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনের টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিও নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি? –ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?" "রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই, তোমার সহিত বাদ-বিসম্বাদ ও কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীন প্রজা। সাধ্য কি রাজকর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা

পালন।

মনুষ্যত্ব – মানুষের প্রকৃত গুণ।

উত্তোলন – উঠানো।

জ্যেষ্ঠপুত্র –বড় ছেলে।

গ্রীবা – ঘাড়।

লেখনী – কলম।

মুদিত – বন্ধ করা।

যথার্থ – খাঁটি।

কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি,মস্তক পাইলে ত তুমি ক্ষান্ত হও?"

"হ্যাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি- মহারাজের নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব। হয়ত ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দাও।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, 'হোসেনের মস্তক রাখিতে সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সাহায্যে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এ স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাঞ্চা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজ-কর্মচারী রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এ যে, নিজ মস্ত ক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে সে তিলার্ধকালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া দেহ সন্ধান করিয়া অন্তে ্যষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এ আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিল, 'পিতা! আমার ভ্রাতৃত্রয় জীবিত থাকিতে আপনার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইবে; এ কি কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক আমাদের জীবন! ধিক আমাদের মনুষ্যত্বে। যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষ পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সে পিতার শির যে কারণে দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে, সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতঃ! আর বিলম্ব করিবেন না, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন, সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ সে উদরও সার্থক। প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশু-পক্ষীদের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য– বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য– আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মা আত্মা প্রাণের প্রাণ, জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদিত করিলেন। কবির কল্পনা আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

সার-সংক্ষেপে

আজরের উপদেশ ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সীমার ক্ষুব্ধ হলো। সে মনে করলো, টাকার লোভে আজর হোসেনের ছিন্নশির রেখে দিতে চান। আজর শপথ করে বললেন যে হোসেনের মাথা দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু সীমারের ভুল ধারণা ভাঙলো না। হোসেনের মাথা না দিলে আজরকে সে হত্যা করবে বলে জানালো। আজর ইচ্ছা করলেই তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সীমারকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তাতে সত্য ভঙ্গ হয়। তিনি বিশ্বাস ঘাতক হয়ে যান। তাছাড়া অযথা নর হত্যার পাপও হবে। তাই স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে আজর নিজের মাথা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলেকে বললেন, তার মাথা কেটে সীমারের হাতে দিতে। তারপর যত্ন করে হোসেনের মাথা কারবালায় নিয়ে যেনো মৃতের সৎকার করা হয়। একথা শুনে আজরের বড়ো ছেলে সায়াদ নিজের মাথা উৎসর্গ করতে চাইলো। যোগ্যপুত্র থাকতে পিতার মাথা কেউ কাটবে একথা সে মানতে পারল না। ছেলের আত্মত্যাগে আজর মুগ্ধ হলো। তাকে এবং তার জননীকে বহুবার ধন্যবাদ জানাল। পরের জন্য এমন আত্মত্যাগেই যে মানব জন্ম সার্থক এবং এমন পুত্রের পিতা হওয়াও যে কতো বড়ো ভাগ্যের কথা, কতো পুণ্যের কথা, তা ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন আজর। তারপর প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং হোসেনের মাথা রক্ষার জন্য তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। বুকে পাথর বেঁধে নিজের হাতে খড়গের আঘাতে কেটে ফেললেন হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ ছেলের মাথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সীমারের কাছে মনুষ্যত্ব বড়ো না টাকা বড়ো – সীমারের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।
২. হোসেনের মাথা রেখে দেয়ার জন্য আজর কী সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কী করলেন, সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ লিখুন।
৩. মনুষ্যত্বের জন্য এবং আদর্শের জন্য এতো বড়ো আত্মত্যাগের কাহিনী আগে কখন শুনেছেন কী? এ কাহিনী জেনে আপনার কি মনে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
৪. সায়াদ পিতা আজরকে কী কী বলেছিলেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

প্রশ্ন : সীমারের কাছে মনুষ্যত্ব বড়ো না টাকা বড়ো?

উত্তর॥ এমাম হোসেনের ঘাতক সীমার আকারেই শুধু মানুষ। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যেমন দয়া মায়া স্নেহ মমতা পরোপকার ইত্যাদি কোনো গুণই নেই। তাই মানুষ হয়েও সে পশু। টাকার লোভে নিষ্ঠুরতম কাজ করতেও তার কোনো কষ্ট হয় না। তার মতে, টাকাই মানুষের প্রধান সম্পদ। টাকা না থাকলে সমাজ, স্বজাতি, ভাই বোন এমন কি স্ত্রীর কাছেও মূল্য থাকে না। কেউ সম্মানও করে না। টাকা না থাকলে রাজাও রাজাকে চেনে না। সাধারণ লোক মান্য করে না। বিপদের সময় জ্ঞান থাকে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল পর্যায়েই টাকা প্রয়োজন। এ জগতে টাকার খেলাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই সীমারের কাছে মানুষ ধর্ম কিংবা মনুষ্যত্বের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি।

প্রশ্ন : সায়াদ পিতা আজরকে কী কী বলেছিলেন, ... লিখুন।

উত্তর॥ সায়াদ আজরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত। এমাম হোসেনের ছিন্ন শির দেখে তিনিও শোকে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। নরপিশাচ সীমারের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং রাগ হয় তাঁর মনে, পিতার সঙ্গে তিনিও প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রাণ দিবেন তবু হোসেনের পবিত্র শির সীমারের হাতে ফেরত দিবেন না। সীমারের দাবিতে আজরকে ছিন্ন শির ফেরত দিতেই হবে। এমন পরিস্থিতিতে আজর নিজের মাথা কেটে সীমারের হাতে দিতে বললেন ছেলেদের। তখন সায়াদ বলেছিলেন যে তাঁরা তিন ভাই জীবিত থাকতে পিতার মাথা দিতে হবে কেন? তাছাড়া তাঁরা কি এমনই নরাকার পশু যে নিজের হাতে পিতার মাথা কাটবেন? তাঁদের অন্তরে কি পিতৃভক্তি নেই? যে পিতার জন্য তাঁরা জগতের মুখ দেখেছেন, মানুষ পরিচয়ে বড় হয়েছেন, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে না পারলে জীবনে সহস্র ধিক। সায়াদ

পিতাকে বলেছিলেন, খণ্ডিত মস্তক পেলেই যদি সীমার চলে যায়, তাহলে অবিলম্বে আমার মাথা কেটে তাকে দিন। গোলমাল মিটে যাক।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আজরের অসাধারণ সাহস এবং ত্যাগের বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- আজরের স্ত্রীর শেষ পরিণাম কি হলো তার বর্ণনা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
কম্পিত হইল – কেঁপে উঠল। **রঞ্জিত হইল** – রঙিন হলো। **পুত্রশোণিত** – পুত্রের রক্তে। **আর্তনাদ** – কাতর চিৎকার। **লুণ্ঠিত হইবে** – গড়াগড়ি যাবে। **মহাহর্ষে** – মহা আনন্দে। **কর্তিত** – কাটা। **শোণিত রঞ্জিত** – রক্তে রাঙা। **বধ** – হত্যা। **নরপিশাচ** – মানুষ রূপী পিশাচ। **নরাধম** – অতি হীন মানুষ। **প্রবঞ্চক** – যে প্রতারণা করে বা ঠকায়। **দস্যু** – ডাকাত। **মহাগোলযোগ** – খুব গোলমাল। **অনর্থক** – বিনা কারণে। **বিনাশ** – নষ্ট। **ধূর্ত** – চালাক। **নিস্তার নাই** – ছাড়াছাড়ি নাই। **সর্বকনিষ্ঠ** – সবচেয়ে ছোটো। **সংবরণ** – দমন।	উঃ! কি সাহস! কি সহ্যগুণ! দেখরে পাষণ্ড এজিদ দেখ, পরোপকার-ব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ। দেখরে সীমার। তুইও দেখ। মনুষ্য জীবনের ব্যবহার দেখ। খড়্গ কম্পিত হইল, রঞ্জিত হইল, পরোপকার, আর মৃত শিরের সৎকার হেতু প্রাণাধিক পুত্রশোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল। লৌহনির্মিত খড়্গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন ঝন রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু আজরের রক্তমাংসের শরীর হেলিল না, শিহরিল না– মুখমণ্ডল মলিন হইল না। ধন্য রে পরোপকার! ধন্য রে হৃদয়! এদিকে সীমার বর্শা হস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।" আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সীমার মহাহর্ষে শির বর্শার বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সদ্য কর্তিত শোণিতরঞ্জিত রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? তুমি উম্মাদ হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক লইয়া গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। আহা! এ বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এ বুঝি তোমার পরোপকার-ব্রত! আরে নরাধম! এ বুঝি তোর সাধুতা! কি প্রবঞ্চক! পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ, আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস?" "ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন একি কথা-এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?" "আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু। টাকার লোভে কাহার কি সর্বনাশ করিবে কে জানে?" "তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই? মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম; এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।" "কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তকের জন্য কারবালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকের জন্য চতুর্দিকে 'হায় হোসেন' হায় হোসেন' রব উঠিতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্তে এ কি? - ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

ভূতলশায়ী করিল – মাটিতে শুইয়ে ফেলল।

সজোরে – জোরের সঙ্গে।

বীরদর্পে – বীরের মতো অহঙ্কারে।

সুবর্ণপাত্র – সোনার পাত্র।

গৃহভ্যন্তরে – ঘরের ভেতরে।

পূর্ববৎ – আগের মতো।

অনুগ্রহ – উপকার।

পাপীয়সী – পাপী (মহিলাকে সম্বোধনের শব্দ)।

রোষভরে – খুব রাগের সঙ্গে।

পামর – পাপিষ্ঠ, নীচ।

বর্শাচ্যুত – বর্শা থেকে পড়ে যাওয়া।

মৃত্তিকায় – মাটিতে।

আত্মবিসর্জন – নিজের প্রাণ দেয়া, আত্মহত্যা করা।

দক্ষিণ হস্ত – ডান হাত।

ক্রোড়ে – কোলে।

নিকটস্থ – কাছের।

"ভাই! তুমি, তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম নহে।"

সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এখানে রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবার হোসেন শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।"

আজরের মুখভার দেখিয়া মধ্যম পুত্র বলিলেন, "পিতঃ চিন্তা কি? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিক-প্রবর চলিয়া যাইবে। অধম সন্তান এ দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।"

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে সীমার আরও আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উম্মাদ কি করিতেছে?" প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে, পাগল! তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কি ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই, ধিক তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ ত অনর্থক বিনাশ করিলে, বলত ইহারা তোমার কে?"

"এ দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ। ছি ছি! তোমার ন্যায় অর্থ-পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি, লইয়া যাও।"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটিই চাহিতেছি, সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনই পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাই না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই। তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না।"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সংবরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিযাছিস? তোর সকলই কপটতা! শীঘ্রই হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।!

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না– তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি, এ যা-একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা।" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গ হস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই।"

	আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল। এ পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না- হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?" "কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।" "আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।" "কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস না? ওরে পাপীয়সী! তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া অনুগ্রহ চাহিস না।" এ বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই আজরের স্ত্রীর খড়্গহস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এ খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি, পরপর আঘাতের স্পষ্টত তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটেই আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি" সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিলেন, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব? আমার বাঁচিয়া থাকা না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এ খড়্গে তিনটি পুত্র গিয়াছে। আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবনসর্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস।" এ কথা বলিতে বলিতে আজরের স্ত্রী সীমারের হস্ত লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শা বিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজরের স্ত্রী মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বেগে পালাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্মবিসর্জন করিলেন—সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন- শির পূর্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

সার-সংক্ষেপ

আদর্শের জন্য আজর নিজের হাতে খড়্গের আঘাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র সায়াদের মাথা কেটে সীমারের সামনে আনলেন। সীমারের ধারণা হলো যে আজর লক্ষ টাকার লোভে হোসেনের মাথা গোপন করে অন্য কারো মাথা কেটে এনেছেন। সায়াদের কাটা মাথা তার সামনে রেখে খণ্ডিত মস্তকটা আনতে বললো সে। আজর দ্বিতীয় পুত্রের মাথা কেটে আনলেন। এবারও সীমার তার কথা রাখলো না। আজরকে প্রশ্ন করে সীমার জানতে পারলো যে ঐ দুটো আজরের পুত্রের মাথা। এতে তার মনের সন্দেহ আরো বেশি হলো। নিশ্চয় আজর টাকার লোভেই এমন করছেন। আবারও সে খণ্ডিত মস্তকটা চাইলো। আজর এবার তৃতীয় পুত্রের মাথা কেটে আনলেন। এবার সীমার ক্ষিপ্ত হয়ে হোসেনের মাথা চাইলে আজর সেটা দিতে অস্বীকার করলেন। সীমার বর্শার আঘাতে আজরকে হত্যা করে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলো যে এটা সোনার পাত্রে হোসেনের মাথা রাখা আছে। আর আজরের স্ত্রী খড়্গ হাতে সেই মাথা পাহারা দিচ্ছেন। সীমার লাফ দিয়ে হোসেনের মাথা আবার বর্শায় গেঁথে ফেললো। আজরের স্ত্রীকে অভয় দিয়ে বললো যে তাকে সে হত্যা করবে না। আজরের স্ত্রী ঘৃণার সঙ্গে তার দয়া প্রত্যাখ্যান করলেন। শোকে দুঃখে ক্রোধে তিনি খড়্গ নিয়ে সীমারকে হত্যার জন্য তেড়ে গেলেন। সীমারের ডান হাতে আঘাতও করলেন। বর্শায় গাঁথা মাথাটা মাটিতে পড়ে গেলো। আজরের স্ত্রী সেটা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইলেন। সীমার তাঁর আঁচল টেনে ধরে হোসেনের কাটা মাথাটা কেড়ে নিলো। হতাশ হয়ে আজরের স্ত্রী খড়্গের আঘাতে আত্মহত্যা করলেন। প্রাণ দিলেন তবু সীমারের হাতে মান দিলেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আজরের হাতে সদ্য কাটা মাথা দেখে সীমার কী বললো, তা সংক্ষেপে লিখুন।
২. আজরের মুখভাব দেখে মধ্যম পুত্র পিতাকে কী বলেছিলেন, তা লিখুন।
৩. আজরের স্ত্রী সীমারকে কী বলেছিলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) "আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

খ) 'এখন বিলম্ব কেনো? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখো।

নমুনা উত্তর

'আমার কি জীবন আছে? ..... কখনই চাহিনা।'

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের 'কারবালার পর' গদ্যাংশে এ উক্তিটি করেছিলেন আজরের স্ত্রী। আদর্শ মানুষ আজরের যোগ্য স্ত্রী তিনি। এমাম হোসেনের পবিত্র ছিন্ন শির কারবালায় নিয়ে সৎকার করার ইচ্ছে ছিলো আজরের পরিবারের সকলের। তাই আজর একে একে তিন পুত্রের মাথা কেটে সীমারকে দিলেন। কিন্তু সীমার তাতে রাজি নয়। তার চাই হোসেনের মাথাটাই। সেটা দিতে অস্বীকার করলে সীমার আজরকে হত্যা করে। তারপরও আজরের স্ত্রী হোসেনের মাথা দিতে অস্বীকার করলে পাষাণ নরপিশাচ সীমার আজরের স্ত্রীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তখন আজরের স্ত্রী কথাগুলো উচ্চারণ করেন।

আজরের স্ত্রী-র 'মরিয়াই আছি' শব্দ দুটির মধ্যে ফুটে উঠেছে নিদারুণ মর্মযাতনা এবং হাহাকার। যে সুখের সংসারে স্বামী পুত্র নিয়ে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ, সেই জীবনের সব স্বপ্ন এবং সুখ তাঁর চোখের সামনেই শেষ হয়ে গেছে। প্রাণাধিক পুত্ররা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন, প্রেমময় আদর্শ চরিত্রের স্বামীকে সীমার হত্যা করেছে। এরপর তাঁর জীবনের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছে অর্থহীন। বেঁচে থাকার অবলম্বন, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুভয়- কোনোটাই তাঁর নেই। এমন করুণ অবস্থায় মানুষের একমাত্র কাম্য হতে পারে মৃত্যু। আজরের স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই তিনি সীমারের অনুগ্রহের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, বেঁচে থাকার অনুভবই যার নেই, তাঁর জন্য অভয়বাণীরও কোনো মূল্য নেই। আজরের স্ত্রীর উক্তিতে পাঠকের প্রাণ হু হু করে ওঠে বেদনায়। চোখে নামে অশ্রুর ধারা, আদর্শের জন্য, মানব ধর্মের জন্য এতো বড়ো ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা চিরকাল জগৎবাসী মনে রাখবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. লেখক সীমারকে উদ্দেশ্য করে কী কী বলেছেন, তার ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখুন।

২. সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন।

৩. আজরের স্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

প্রশ্ন : আজরের স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর ॥ "কারবালার পর" গদ্যাংশে আজরের স্ত্রী ভূমিকা খুবই কম। কিন্তু ঐ অল্প পরিসরেই আজরের স্ত্রী অসাধারণ চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বামী এবং তিন পুত্র নিয়ে তার ছোটো সংসার, কাহিনীতে যতোটুকু বোঝা যায়, আজরের সংসারের সুখ ও শান্তির অভাব ছিলো না। স্বামীর আদর্শকে তিনি সম্মান করতেন। স্বামীর সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দের সত্যিকার অংশিদার ছিলেন তিনি। স্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁর ছিলো অগাধ আস্থা। তাই আমরা দেখি, আজরের স্ত্রী স্বামী ও পুত্রদের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির তাঁরা কারবালায় নিয়ে যাবেন। সীমারকে কিছুতেই দিবেন না। এর জন্য পরিবারে যতো বিপদই আসুক না কেনো তাঁরা মাথা পেতে নিবেন। আজরের স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ ধৈর্যশীল এবং ত্যাগী মহিলা। ইমাম হোসেনের পবিত্র শির রেখে দেয়ার জন্য তাঁরই চোখের সামনে একে একে তিনটি ছেলের মাথা কেটেছেন আজর। তিনি বিলাপ করেন নি কিংবা স্বামীর উপর ক্ষুব্ধ হন নি। অসীম ধৈর্যে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের ধন প্রাণের নিধিরা সবাই নিহত হলে, বাধা দিলেন না তিনি একবারও। এমন ধৈর্যের চিত্র কল্পনা করাও কঠিন।

ত্যাগের মহান আদর্শে আজরের স্ত্রী ছিলেন স্বামী পুত্রের অনুসারী। ইচ্ছে করলে তিনি স্বামী পুত্রকে উসকে দিয়ে সীমারকে হত্যা করার পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে যান নি। বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাননি অতিথির সঙ্গে। বরং বেছে নিয়েছেন চরম আত্মত্যাগের পথ। এমন কঠিন ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। পরের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃতের সৎকার করা বিবেকবান মানুষের ধর্ম। আর সে মানবধর্ম পালন করতে গিয়ে তিনি সবই হারালেন। শোক প্রকাশ করে ত্যাগকে ছোটো করলেন না। আজরের স্ত্রীর ত্যাগের পরিমাপ করতেও আমাদের হৃদয় কাঁপে।

প্রখর আত্মসম্মানবোধ ছিলো আজরের স্ত্রীর। নরাধম সীমার যখন তাঁকে হত্যা করবে না জানালো, তখন তিনি তার দয়া প্রত্যাখ্যান করলেন ঘৃণার সঙ্গে। যে পাষণ্ডের জন্য তাঁর স্বামী পুত্র সবাই প্রাণ দিয়েছেন, সে পাষণ্ডের দয়া বা অনুগ্রহ নেয়ার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন তিনি।

আজরের স্ত্রী ছিলেন সাহসী। স্বামী-পুত্ররা নিহত হওয়ার পরও তিনি খঞ্জর হাতে হোসেনের পবিত্র ছিন্ন শির পাহারা দিচ্ছিলেন। হিংস্র পশু সীমারের হাত থেকে ঐ পবিত্র মাথা তিনি রক্ষা করতে পারবেন না জেনেও আত্মসমর্পণ করেন নি। সীমার ঘরে ঢুকে হোসেনের ছিন্ন শির যখন বর্শায় গেথে নিলো, তখন আজরের স্ত্রী মুখে একবার মাত্র দুঃখের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনি। তিনি বলেন- এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইলো না, হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পরিলাম না, ইহাই দুঃখ।' আজরের স্ত্রীর এ উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অতুলনীয় আদর্শের কথা। সব হারিয়েও তাঁর দুঃখ হয়েছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারার জন্য। কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করতে ছাড়েন নি। সীমারকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করেছেন। হত্যা করতে চেয়েছেন নরপশুকে। ইচ্ছে ছিলো, সীমার নিহত হলে তিনি ইমাম হোসেনের মাথা কারবালায় নিয়ে যাবেন।

পাষাণ হৃদয় সীমারকে তিনি হত্যা করতে পারলেন না। খঞ্জরের আঘাতে হোসেনের মাঘাটা বর্শা থেকে খুলে পড়ে গেলো। আজরের স্ত্রী সেই মাথা কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইলেন। কিন্তু সীমার তাঁকে ধরে ফেললো এবং কেড়ে নিলো ছিন্ন শির। তখন হতাশ হয়ে আজরের স্ত্রী পড়ে থাকা খড়গ দিয়ে আঘাত করে নিজের প্রাণ দিলেন। পরের জন্য এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগের কারণে আজরের স্ত্রীর চরিত্র আমাদের মনের গভীরে দাগ কাটে। এমন মহৎ ও মানবতাবাদী চরিত্রের প্রতি আমরা সম্মান না জানিয়ে পারি না।

প্রশ্ন : লেখক সীমারকে উদ্দেশ্য করে কী কী বলেছেন, তার ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর ॥ বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের 'কারবালার পর' অংশে সীমার চরিত্রের নিষ্ঠুরতম দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। কারবালার যুদ্ধ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় নাতি ইমাম হোসেনের পরিবার পরিজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা আজো ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মনে রেখেছেন। বিশেষ করে ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে কারবালা প্রান্তরের আকাশ বাতাস সেদিন শোকে আকুল হয়ে কেঁদেছিলো। চারদিক থেকে কেবল 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' শব্দের বিলাপ শোনা যাচ্ছিলো। আর আহত ইমাম হোসেনের মৃত্যু হয়েছিলো পাষণ্ড সীমারের খঞ্জরের আঘাতে। এ ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কথা মানুষ ভোলেনি। কোনোদিন ভুলতেও পারবেনা। মোহররম মাসের শোক দিবসে সীমারের প্রতি নতুন করে মানুষের মনে ঘৃণার ভাব জাগে।

কারবালার সেই মহাশোকের ঘটনার শত শত বছর পরেও তাই লেখক মীর মশাররফের ভাষায় সীমারের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে ঘৃণা এবং ধিক্কার। সীমারকে তিনি পাষণ হৃদয়ের লোক বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ মৃত্যুর পর পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে মানুষের লেনদেন শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু মানুষকে কিংবা মৃত মানুষের কোনো অঙ্গে নির্যাতন করা তখন চরম অন্যায়। কেউ তা করেও না। কিন্তু সীমার এমনই পশু যে হোসেনের ছিন্ন মস্তক সে বর্শার আগায় গেঁথে নিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়াচ্ছে। লেখক কল্পনায় পশু সীমারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি জানতে চান, কেনো ইমাম হোসেনের পবিত্র দেহ থেকে সে মাথা কেটেছে? কেনোই বা সে পবিত্র মাথা বর্শায় গেঁথে নিয়ে সে দৌঁড়াচ্ছে? তার স্বার্থ কী?

এজিদের নির্দেশে সীমার পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম কাজ করেছে। ইমাম হোসেনের কাটা মাথা এজিদকে দেখতে পারলে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। শুধুমাত্র অর্থের লোভে সীমার এ ঘৃণ্য কাজটা করেছে। লেখক বলছেন যে ইমাম হোসেন তো সীমারের কোনো ক্ষতি করেন নি। ইমাম হাসানের স্ত্রী জয়নাবের রূপেও সে মোহিত হয় নি। তাহলে কেনো সে এমন নির্মম আচরণ করলো ইমাম হোসেনের সঙ্গে।

লেখকের মতে শুধু টাকার লোভে সীমার পশু হয়ে গেছে। তাই অর্থের প্রতি লেখকের প্রচণ্ড ঘৃণার কথা যেনো সীমারের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছে। অর্থের জন্য পৃথিবীতে যতো অনর্থ ঘটে ইমাম হোসেনের করুণ পরিণতি তারই একটি। অর্থের জন্যই জীব ও জীবনের ধ্বংস হয়, সম্পত্তি নষ্ট নয়, পিতা পুত্রে শত্রুতা হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়, ভাই বোনে ঝগড়া হয়, রাজার সঙ্গে প্রজার গোলমাল হয়, বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু তবুও অর্থের কি মোহিনী শক্তি! এতো অশান্তি, এতো দুঃখ এবং এতো অনাসৃষ্টি সত্ত্বেও রাজা প্রজা ধনী নির্ধন যুবক বৃদ্ধ প্রেমিক– সবাই অর্থ লাভের জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকে। এ অর্থের জন্য তীর, তরবারি, বন্দুক ও বর্শার আঘাতও সহ্য করে। অর্থের লোভে মানুষ অগাধ জলে ডুব দিতে পারে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করতে পারে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারে, রক্ত দিতে পারে, মাংস কেটে ফেলতে পারে, এমন কি নিজের জীবনটাও বিকিয়ে দিতে পারে। অতীত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের চিন্তাও লোপ পায় এ অর্থেরই জন্য। যেমন ঘটেছে সীমারের ক্ষেত্রে।

লেখক অর্থকে বলেছেন – কুহক। এ কুহক বা মায়ায় পড়ে সবাই। অর্থের মায়ায় ও মোহে মানুষের মায়া দয়া স্নেহ মমতা বিবেক বুদ্ধি ভালোবাসা যুক্তি জ্ঞান চিন্তা দর্শন সবই লোপ পায়। মানুষ ঠকে তবু লজ্জা বা অনুশোচনা হয়। সবার কাছে নিন্দার পাত্র হয় তবু দমে যায় না। ধিকৃত ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে জেনেও অর্থ লোভ বিসর্জন দিতে পারে না মানুষ। সীমার তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ অর্থলোভেই ইমাম হোসেনকে সীমার হত্যা করেছে। লেখকের বিচারে অর্থও পাতকী। সীমারও পাতকী। কবির কল্পনাতেও এদের পাপ নামের ঠাঁই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : সংক্ষেপে আজরের চরিত্র বর্ণনা করুন।

উত্তর ॥ 'কারবালার পর' গদ্যাংশে আমরা আজরকে পেয়েছি অতি সাধারণ এক গৃহী হিসেবে। ঘরে তাঁর তিন পুত্র সন্তান এবং এক স্ত্রী। আজর একেশ্বরবাদী নন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার শিষ্যও নন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন আজর। তাঁর গৃহে নানা দেব দেবীর মূর্তি। তিনি দেব দেবীর উপাসনা করেন। খুব সাদামাটাভাবে জীবন যাপন করতো তিনি। তাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সীমারকে দেখে তিনি উচ্চপদস্থ কোনো রাজ কর্মকর্তা ভেবেছিলেন প্রথমে।

আজর খুব অতিথি পরায়ণ। যদিও সীমারের বর্শার আগায় গাঁথা ছিলো ছিন্ন শির, তবু পথিক যে ক্লান্ত সেটা তিনি বুঝেছিলেন। পথিক যখন তাঁর গৃহে রাত কাটাতে চাইলো তখন আজর সমাদর করে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন

এবং আশ্রয় দিলেন। তার ক্লান্তি দূর করার জন্য সেবা যত্ন করলেন। নানা রকম খাবার দাবার এনে রাখলেন অতিথির সামনে। ভক্তির সঙ্গে তাকে খাওয়ালেন এবং গৃহে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সাধারণ মানুষ হলেও আজর ছিলেন সৎ এবং কৌতূহলী। তাঁর মনে কোনো পাপবোধ ছিলো না বলেই অতিথিকে অতি সহজে প্রশ্ন করতে পেরেছিলেন যে – অতিথি কোথা থেকে এসেছেন এবং বর্শায় বিদ্ধ মাথাটা কার? এ তথ্য জানার কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিলো না। নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তিনি বর্শায় বিদ্ধ শিরের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

মধুর ব্যবহার এবং বিনয় ছিলো আজরের চরিত্রের অন্য দুই বৈশিষ্ট্য। সীমারকে কোনো প্রশ্ন করার সময় তিনি অনুমতি নিয়েছেন এবং 'মহাশয়' সম্বোধন করে ভদ্রতা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বেশি কথা বললে অথবা অনর্থক কৌতূহল প্রকাশ করলে অতিথি যেনো অসন্তুষ্ট না হয় সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির সাবধানে রাখার পরামর্শ দেয়ার সময় তাই আজর বলেন –আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। অতিথির সঙ্গে আজরের এমন বিনয়ী ব্যবহারের আদর্শকে আজো আমরা সকলেই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি।

আজর ছিলেন সাবধানী এবং দায়িত্ববান। অতিথির লক্ষ টাকার ছিন্ন শির কেউ যদি কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে কেড়ে নিয়ে যায়, তাই নিজের ঘরে তা যত্ন করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া অতিথি ক্লান্তির কারণে গভীর ঘুমে অচেতন হলেও কেউ তা চুরি করতে পারে। সুতরাং সাবধানী আজর ছিন্নশির নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে অতিথিকে স্বস্তি দিতে চেয়েছিলেন। অতিথির সেবা করলেই শুধু চলবে না, অতিথির সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিতে হবে এ ছিলো আজরের চিন্তা। সামাজিক জীবনে অতিথি সেবার কদর চিরকাল ছিলো, এখনও আছে। কিন্তু অতিথি সেবায় তার জান মালের নিরাপত্তার জন্য আজরের যে সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় আমরা এখানে পাই তা যথার্থ অসাধারণ। অতিথি সেবার এমন নৈতিক আদর্শ আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আমরা নিজেদের জীবনে এ গুণগুলো অর্জন করতে পারি। তাতে উপকৃত হবো আমরা। উপকৃত হবে সভ্য সমাজ। সাধারণ গৃহী হয়েও আজর তাই অসাধারণ এক নীতিবান মানুষ হিসেবে আমাদের মনে স্থান করে নেয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. 'আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।'

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. কয়েকটি বাক্যের গঠন লক্ষ্য করুন :

ক. কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ (দৌড়াইতেছো/দৌড়াচ্ছো)?

খ. তুমি ত আর জয়ানাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না (হওনি)?

গ. তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া (শিউরে) ওঠে।

ঘ. ভ্রাতঃ, তোমার নামটি কি শুনিতে (শুনতে) চাই।

ঙ. সকলে একত্র হইয়া (হয়ে) শোকে কাঁদিতে (কাঁদতে) লাগিলেন (লাগলেন)।

* বন্ধনীতে দেয়া ক্রিয়াপদগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুলো চলিত ভাষায় রচনা করুন।

২. এজিদের চরিত্রে পাঁচটি বিশেষণ প্রয়োগ করে পাঁচটি বাক্য চলিত ভাষায় রচনা করুন (পাঠ থেকে বিশেষণ বেছে নিন)।

৩. উপযুক্ত বিশেষণ ব্যবহার করে আজর সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশংসার বাক্য রচনা করুন।

৪. সাধুরীতির দশটি ক্রিয়াপদ লিখুন এবং পাশাপাশি তাদের চলিত রূপও লিখুন (পাঠ থেকে বেছে নিন)।

সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ লিখুন এবং পাশাপাশি তাদের চলিত রূপও লিখুন।

৬. সাধু ও চলিত রীতির ভাষায় বৈশিষ্ট্য কী কী?

৭. দশটি শব্দের সমার্থক শব্দ শিখুন। যেমন

দিনমনি : সূর্য, রবি, ভানু, তপন, সবিতা, মিহির
কুহক : মায়া, ইন্দ্রজাল, প্রতারণা, ছলনা, ভেলকি
নিশা : রজনী, রাত্রি, নিশি, রাত
অগাধ : অতলস্পর্শ, অতি গভীর, অথৈ, তল পাওয়া যায় না এমন গভীর
শির : মাথা, মস্তক, অগ্রদেশ, উপরিভাগ, মুণ্ড
প্রত্যুষ : সকাল, ঊষা, প্রভাত, ভোর
আরাধনা : উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা, আবেদন
চক্ষু : চোখ, নেত্র, লোচন, আঁখি
দ্বেষ : হিংসা, ঈর্ষা, শত্রুতা, বিরাগ
মূঢ় : মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞান, অবিবেচক।

৮. বিড়াল তপস্বী, ভণ্ড, গুরু, কপট ঋষি, স্বার্থপর পীর- এগুলো কি সমার্থক শব্দ?

৯. পাঁচ ধরনের বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

১০. দশটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা হলো, পড়ুন এবং নিজে নিজে আরও দশটি শব্দ (পাঠ থেকে বেছে নিয়ে) বিশ্লেষণ করুন।

পিতার :	পিতা+র	কথাটির : কথা+টির
উদরে :	উদর+এ	বাহাদুরী : বাহাদুর+ঈ
মানুষের :	মানুষ+এর	জীবনকে : জীবন+কে
আত্মীয়তা :	আত্মীয়+তা	অর্থলোভী : অর্থলোভ+ঈ
কারবালায় :	কারবালা+য়	পাইলে : পা+ইলে

১১. দশটি যৌগিক শব্দ শিখুন; নিজে নিজে বিশ্লেষণ করুন :

পুত্রশোনিত, হিতোপদেশ, স্কন্ধোপরি, রাজাশ্রিত, পরোপকার, জন্মগ্রহণ, পিতৃভক্তি, বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ, জীবনান্তে ।

নমুনা উত্তর

৪. সাধুরীতির দশটি ক্রিয়াপদ :

ঘটিয়াছে – ঘটেছে,	দেখিলাম – দেখলাম
বলিল – বললো	আসিয়া – এসে
আনিয়া – এনে	করিবে – করবে
হইল – হলো	ঠকাইতে – ঠকাতে
জুড়াইল – জুড়ালো	যাউক – যাক

৫. সাধুরীতির দশটি সর্বনাম পদ লিখুন।

তাহা – তা,	ইহা – এ
কাহার – কার	এখানে – এখানে
তাঁহার – তাঁর	ইহার – এর
যাহা – যা	ইহারা – এরা
উহার – ওর	কাহাকে – কাকে

৬. সাধু ও চলিত রীতির ভাষার বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর : সমস্ত উন্নত ভাষারই দুটি রূপ, লিখিত এবং মৌখিক। লিখিত ভাষার আবার দুটি রীতি, সাধু রীতি এবং চলিত রীতি। মৌখিক ভাষারও দুটি রীতি, শিষ্ট বা মানযুক্ত রীতি এবং আঞ্চলিক রীতি। রেখার সাহায্যে দেখানো হলো

	মৌখিক		সাধু রীতি	শিষ্টরীতি
ভাষা	লিখিত ভাষা		মৌখিক ভাষা	
	লিখিত		চলিত রীতি	আঞ্চলিক রীতি

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো

ক. বাক্যে সর্বনামের বড়ো রূপ ব্যবহৃত হয়, যেমন; ইহার, ইহাদের, তাহার, তাহাদিগের, ইত্যাদি।
খ. বাক্যে ক্রিয়ার বড়ো রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন; করিয়াছিলো, খাইয়াছে, পড়িতেছিলো, পারিবে, ইত্যাদি।
গ. বাক্যে তৎসম বা গুরুগম্ভীর শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন, মস্তক, স্কন্ধ, হস্ত, বক্ষ, ইত্যাদি।
ঘ. বাক্যে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন; নিকটস্থ, রোষাগ্নি, সপ্ততল, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো

ক. বাক্যে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, যেমন; এর, এদের, তাদের, তার, ইত্যাদি।
খ. বাক্যে ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, করেছিলো, খেয়েছে, পড়ছিলো, পারবে, ইত্যাদি।
গ. বাক্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার কম। যেমন; মাথা, কাঁধ, হাত, বুক ইত্যাদি।
ঘ. বাক্যে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার কম। যেমন; কাছে, সাত তলা, জিনিস, রোষের আগুন, ইত্যাদি।

আরও যা পড়তে পারেন

'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজি মিঞার বস্তানী'- এগুলো পাবেন বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর বিভিন্ন খণ্ডে।

আদর্শ মহাপুরুষ

শেখ আবদুর রহিম

লেখক পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমায় ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন শেখ আব্দুর রহিম। প্রতিকূল অবস্থার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেও প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তবে নিজের চেষ্টায় তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেন তাঁর পরিমাণ খুব কম ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম বাংলার যুগে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম 'সুধাকর' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্বাতন্ত্য ঘোষণা করেন। সেকালে তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলিম লেখকদের সুধাকর দল গড়ে উঠেছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার মুসলমান বিশ্ব মুসলিমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতি হিসেবে মুসলমানের এক বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামি ভাবের সুষ্ঠু প্রয়োগের ভেতর দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা তিনি করেছেন।

১৯৩১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রচনাবলী : হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি, 'ইসলাম ইতিবৃত্ত', 'ইসলামনীতি' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী', 'নামাজতত্ত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তিমালা', 'হজবিধি', 'রোজাতত্ত্ব', 'খোৎবা', 'ইসলাম তত্ত্ব' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়।

ভূমিকা

"আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধটি শেখ আব্দুর রহিমের 'হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এ প্রবন্ধে লেখক যুক্তিতর্ক, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মিতা ও আবেগহীন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবন ও চরিত্রকে তুলে ধরেছেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. লেখক-সাংবাদিক আব্দুর রহিমের রচনা, ভাষারীতি, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স.) এর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মানব জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ (স.) কেন আদর্শ মহাপুরুষ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
আসঙ্গলিপ্সু – সাহচর্যকামী। **অবিনশ্বর** – অমর, চিরস্থায়ী, অক্ষয়। **চতুর্ভুজ** – চার হাত। **উন্মুক্ত** – খোলা। **অপরিণামদর্শী** – যে পরিণাম চিন্তা করে না। **সংসারোদ্যান** – সংসাররূপ বাগান। **নশ্বর** – যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অস্থায়ী। **ভবপারাবারে** – সংসার সমুদ্রে, এখানে পৃথিবী বা বাস্তব সংসারকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **জীবন তরী** – মানব জীবনরূপ তরী বা নৌকা। **সংসর্গ** – সংস্পর্শ, মিলন। **পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী** – যিনি পারলৌকিক তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক জানেন। **সিদ্ধপুরুষ** – জীবন ও জগতের রহস্য সম্পর্কে যাঁরা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা। **দিব্যচক্ষে** – অলৌকিক বা দৈব দৃষ্টি দিয়ে।	গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আরস্তুতল বলিয়াছেন যে, মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু। মানব-সৃষ্টির উপাদানগুলির মধ্যে প্রেম একটি উপাদান ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। খোদাতাআলা মানবকে তার আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার দেহের মধ্যে আত্মপ্রবেশ করাইয়া দিয়া মানবকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এ কারণবশত মানব যখন অবিনশ্বর জগৎ হইতে নশ্বর জগতে পদার্পণ করে, তখন সেই খোদাতাআলার প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবী খোদাতাআলার আশ্চর্যজনক সৃষ্টি-কৌশলে পরিপূর্ণ। যদিও মানবাত্মচতুর্ভুজরূপে প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তথাপি তাহার গমনাগমনের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহার উন্নতিমার্গে আরোহনার্থ একদিকে সোপানশ্রেণী সংলগ্ন রহিয়াছে; যদি সে উদ্যম সহকারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে খোদাতাআলার অনুগ্রহে উক্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক উন্নতিমার্গে আরোহন করিতে সক্ষম হয়। আবার অন্য দিকে তাহার জন্য অবনতির দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, যদি তাহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয় তাহা হইলে অজ্ঞানতারূপ লৌহনির্মিত হস্ত উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন সেই অপরিণামদর্শী মানবাত্মঅবনতির গভীরতম গর্ভে নিপতিত হয়। একদিকে বিবেক ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মক জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছে। এরূপ ভয়ানক অবস্থার বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইলে আমরা কেবল বলিতে থাকি, হায়, কি বিষম ব্যাপার! কি ভয়ানক প্রবল কাল সমুপস্থিত!! হে খোদাতাআলা, তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন!!! গন্তব্যপথ মহাবিপদসঙ্কুল! এ প্রবাসস্থান মহাবিভীষিকাপূর্ণ!! এমন কি, এখানে মহাবীরগণও নিরুদ্দেশ!!! জ্ঞানীগণের জ্ঞান লুপ্ত! বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বানগণ বিকম্পিত!!! এরূপ বিষয় সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় এ সংসারোদ্যানে (যাহাতে পুষ্পঅপেক্ষা কণ্টক অধিক) বিপদসঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা সহজ ব্যাপার নহে। এ ভবপারাবারে যখন সকলেই একই জীবনতরীতে আরোহণপূর্বক গন্তব্যস্থানে গমন করিতেছি, একই প্রবৃত্তিরূপ পাইলের উপর সকলেরই ভরসা রহিয়াছে এবং শেষে একই প্রবল ধ্বংস-ঝটিকায় উক্ত তরী মহাকালসাগরে নিমজ্জিত হইবে, তখন পরস্পরের টানাটানিতে বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে অবস্থিতি করিয়া, বিপদ-আপদকীর্ণ অবস্থায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকিয়া এবং আমোদ-প্রমোদে এ বিপদ সঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা উদারহৃদয় মহাত্মাদিগের কার্য। বাস্তবিকই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া

টীকা

গ্রীস – ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র, গ্রীস প্রাচীন সভ্যতার জন্য

বিখ্যাত। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। গ্রীস ছিল পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও শিল্পীদের লালনভূমি।

পণ্ডিত আরস্তুতুল – "আরস্তুতল' প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল-এর আরবি উচ্চারণ। মহামনীষী দার্শনিক এরিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। এরিস্টটল আঠার বছর বয়সকালে এথেন্স যান এবং প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। প্লেটোর একাডেমিতে তিনি আট বছর অধ্যয়ন করেন এবং ৩৩৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩২৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দকাল পর্যন্ত তিনি এথেন্সে অবস্থান করেন। এরিস্টটলের মতো পণ্ডিত পৃথিবীতে খুব কমই জন্মলাভ করেছেন। দর্শন, কাব্য, ইতিহাস, নাটক, কাব্যতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা তাঁর হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এরিস্টটলের রচিত গ্রন্থ সংখ্যা সম্পর্কে নানা মত রয়েছে।

নির্মলভাবে জীবনাতিবাহিত করা খোদাতাআলার প্রদত্ত ক্ষমতা। ইহাই কার্য-কুশলতার জীবনস্বরূপ। চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সুনিয়মে প্রজাপালনকার্যে সম্পর্ণ উত্তীর্ণ হওয়া মহাজ্ঞানীর কার্য। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন তপস্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান বীরপুরুষ ও সিন্ধুপুরুষগণও সমস্তই এ বিষয়ে পাঠশালার শিশুদিগের ন্যায় অজ্ঞ! এরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ঐ ব্যক্তি হইতে পারেন, যাঁহাতে সর্বজ্ঞানী খোদাতাআলার অসীম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং যাঁহাতে যাবতীয় সৃষ্টি পদার্থের তত্ত্ব, প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃত অবস্থা দিব্যচক্ষে প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং যাঁহার নিকট পৃথিবীস্থ দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও শিশুবৎ অনিভজ্ঞ, যিনি আরবের এমন অশিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি খোদাতা'আলার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সার-সংক্ষেপ

দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। স্রষ্টা মানুষের মধ্যে অর্পণ করেছেন প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতি। আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে দিয়েছেন জ্ঞান ও অজ্ঞতা, দিয়েছেন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। মানুষ ইচ্ছামত ভালমন্দ দুই-ই করতে পারে। এ পৃথিবীতে অনেক বীরের পদস্খলন হয়। বিধাতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সঠিক পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। বিধাতার সেই অসীম অনুগ্রহের আলোকে স্নাত হয়েই দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করেছিলেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। আরবের অশিক্ষিত বর্বর জন সমষ্টিকে তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করেছিলেন। তাই তিনি আল্লাহর প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নিচে বামপাশের প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান পাশের খালি জায়গায় সংক্ষেপে উত্তর লিখুন

প্রশ্ন	উত্তর
১. আদর্শ মহাপুরুষ কে ? কেন তাকে আদর্শ মহাপুরুষ বলা হয়েছে?	১.
২. এখানে মহাবীরগণও নিরুদ্দেশ!!! জ্ঞানিগণের জ্ঞান লুপ্ত। বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বানগণ বিকম্পিত!!! কেন?	২.

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু।

"মানব স্বভাবত আসঙ্গলিপ্সু" আলোচ্য বাক্যটি শেখ আব্দুর রহিম বিরচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এ উক্তিতে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি ও স্বভাব ধর্মের কথা বলেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই এ পৃথিবীতে মানুষ সমাজ, গৃহ ইত্যাদি গঠন ও প্রতিষ্ঠা করে পরস্পর প্রীতি, ভালবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে বসবাস করে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের সঙ্গ কামনা করা। মানুষের মধ্যে স্রষ্টা যে সব উপাদান আরোপ করেছেন তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রেম। মানুষের মধ্যে আরও নানাবিধ গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার প্রতিনিধিরূপে। সুতরাং মানুষে-মানুষে সান্নিধ্য ও পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সামাজিক বাঁধনই মানুষের চিরদিনের স্বভাবধর্ম।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- মহানবীর সঙ্গে বিবি খোদেজার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- তৎকালীন মক্কা নগরীর অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
ঐকান্তিক – অত্যধিক, একনিষ্ঠ। **সর্বোতভাবে** – সম্পর্ণরূপে।	পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনাসত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু খাদিজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া গেল। খাদিজা বিবি যেমন আপনাকে তাঁহার

উৎসর্গ – নিবেদন।

দূর্দান্ত – দূর্দমনীয়।

হৃতসর্বস্ব – যার সবকিছু অপহৃত হয়েছে।

তৎসমুদয় – সেসব।

টীকা

খোদেজা বিবি – হযরত মুহম্মদ (স.) এর ধনশালী স্ত্রী। বিবি খোদেজাই প্রথম ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

চরণতলে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গণ্যমান্য কুরায়েশদিগের সাক্ষাতে স্বীয় অতুল ধন-সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব দরিদ্র হযরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজা বিবির বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তৎসমুদয় সৎকার্যে, সদনুষ্ঠানে ও সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন উচ্চমনা ছিলেন, পরম দয়ালু খোদাতাআলা তাঁহাকে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পিতামহ মোত্তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসন সংরক্ষণের ক্ষমতা কুরয়শদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে মক্কা নগরের মধ্যে অশান্তি ও অত্যাচারের প্রবল স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। কি স্বদেশী কি বিদেশী প্রায় অনেকেরই ধন-সম্পত্তি ও অনেক সময়ে স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত দুর্দান্ত দস্যুকুল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইত এবং তদুপলক্ষে অনেক নিরীহ পথিকের তপ্ত শোণিতে নগরের রাজপথসমূহ রঞ্জিত হইয়া পড়িত। একদা হেনজেলা নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ মক্কাবাসী আবদুল্লাহ বিন-জুদায়ানের নিকট যাইতেছিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিলে রাজপথের উপর প্রকাশ্যভাবে তাঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। জোবেদা নামক একজন ব্যবসায়ী বিরল পণ্যদ্রব্যসহ মক্কা নগরে উপস্থিত হইলে কুরয়শ-সরদার আসেম-বিন-ওয়েল নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করেন; কিন্তু ক্রীত দ্রব্যজাতের মূল্য কিছু মাত্র না দিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক তাড়াইয়া দেন। তখন জোবেদা অনন্যোপায় হইয়া তৎকালীন নামমাত্র শাসনকর্তাগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি হৃতসর্বস্ব হইয়া মনের ক্ষোভে ও আক্ষেপে মক্কার শাসনক্ষমতা প্রভৃতির নিন্দাবাদ করিতে থাকেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথম জীবনে ছিলেন অভাবগ্রস্ত। দরিদ্র মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি তখন ইচ্ছামত দান করতে পারেননি। বিবি খোদেজাকে বিয়ে করার পর তাঁর অভাব ও দারিদ্র্য দূর হল। বিবি খোদেজা তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য হযরতের চরণতলে উৎসর্গ করলেন। হযরত মুহম্মাদ (স.) বিপুল ধনসম্পদ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মত জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতামহ আব্দুল মোতালেবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসনকার্যের ভার কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। ফলে মক্কার জনজীবনে নেমে আসে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। প্রকাশ্য ডাকাতি ও রাহাজানির ফলে মানুসের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করাও কঠিন হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. বিবি খোদেজা তাঁর ধন সম্পত্তি কী করেছিলেন?	১.
২. মক্কার শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল?	২.

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হলফ-উল,ফযুল সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- তৎকালীন মক্কাবাসীদের ধর্মবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
উপর্যুপরি – পরপর। **কস্মিনকালে** – কখনো। **সুরাপায়ী** – মদ্যপায়ী। **আখড়া** – আড্ডা। **মদিরালয়** – মদের ঘর। **বীভৎস কাণ্ড** – ভয়ানক ব্যাপার। **হিতকর** – মঙ্গলকর। **টীকা** **হলফ-উল্-ফযুল** – মক্কায় শান্তি স্থাপনের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে হাশিম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক গোত্রের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির নাম 'হলফ-উল্-ফযুল।' **কাবাগৃহ** – মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগৃহ।	উপর্যুপরি ঐরূপ দুইটি ঘটনার সংবাদ পাইয়া হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা নগরে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে হাশিম বংশধর ও কুর্‌য়শ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্বপ্রকার অত্যাচার অশান্তি নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মুসলমান ইতিহাসে এ প্রতিজ্ঞাই 'ফযুল প্রতিজ্ঞা' (হলফ্-উল্-ফযুল) নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্বকালে জরহম বংশের তিনজন সদাশয় পুরুষ নগরের অত্যাচার দমনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, ঘটনাক্রমে সেই তিনজনেরই নাম ফযল ছিল। 'ফযল আরবি ব্যাকরণের বহুবচনে 'ফযুল' শব্দে পরিবর্তিত হয়। ঐ পূর্বতন নাম অনুসারে এ প্রতিজ্ঞারও নাম 'হল্‌ফ-উল্-ফযুল' বলিয়া অভিহিত। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঐ সমিতির গঠন দ্বারা পথিক, পরিব্রাজক, বণিক ও ধনী-দরিদ্র সকলেরই আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং মক্কা নগরের মধ্যে সর্বতোভাবে শান্তি সংস্থাপিত হয়। উপরি-উক্ত সদনুষ্ঠানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কুর্‌য়শদিগের প্রতিজ্ঞানুরূপ তাহাদের সহকারিতা ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কস্মিনকালে তাহাদের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই এবং কখনও কোন প্রতিমূর্তির পূজা করেন নাই, কিংবা কুর্‌য়শদিগের ন্যায় প্রতিমূর্তিগুলিকে খোদাতাআলা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এ সময়ে মক্কা শহরটির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। পবিত্র কাবাগৃহ সুরাপায়ী মাতালগণের এক প্রধান আখড়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সময় কাবাগৃহটি দর্শন করিলে মদিরালয় বলিয়া অনুমিত হইত। নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত থাকিত। কেবল একটি পবিত্র-হৃদয় যুবক দূর হইতে ঐ সকল বীভৎস কাণ্ড দর্শন করিয়া নরপিশাচদিগের জন্য সর্বদা আক্ষেপ করিতেন এবং সর্বদা তাহাদের জন্য বিষণ্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেন। এদিকে আবার সাধারণ হিতকর কার্যে সকলের সঙ্গে সহাস্যবদনে মিলিত হইতেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তিনিই সর্বাগ্রে তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। মানব সমাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক কার্যে যোগদানপূর্বক খোদাতাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা, রাহেব বা যোগীদের ন্যায় জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া জঙ্গলে বা গিরিগুহায় গমনপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খোদাতাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা তত কঠিন কার্য নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার সমাজ জীবন থেকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন "হলফ-উল্-ফযুল' সমিতি। হাসেম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

পবিত্র কাবাগৃহ কুরায়েশদের নানা প্রকার দূরাচারী ক্রিয়াকর্মের ফলে মদিরালয়ে পরিণত হয়েছিল। তখন মক্কায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। মক্কার এরূপ সামাজিক অধঃপতন হযরত মুহাম্মদ (স.) কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. কী উদ্দেশ্যে 'হলফ-উল-ফযুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?	১.
২. মক্কার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?	২.

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গজালল কাবা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- কাবাগৃহ সংস্কার সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
গজালল কাবা – কাবা ঘরের দুটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ। **করাল** – ভীষণ। **প্রপীড়িত** – নির্যাতিত। **হজরে আসোয়াদ** – কৃষ্ণ পাথর।	কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, কাবার মধ্যে দুইটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ (গজালল কাবা) ছিল। সেই হরিণদ্বয়ের উদর মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্য নিহিত ছিল। কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য আত্মাৎ করিবার জন্য গুপ্তভাবে কাবার ভিত্তি খনন করিয়া তাহা হস্তগত করে। তজ্জন্য ভিত্তির পার্শ্বে একটি গভীর গর্ত হয়, সেই গর্তে বৃষ্টির জল প্রবেশ করায় প্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠে। কেহ বলেন যে, কাবার দ্বারগুলি পার্শ্বস্থ ভুমির সহিত সমতল অবস্থায় ছিল বলিয়া বৃষ্টি হইলেই কাবার মধ্যে জল প্রবেশ করিত। আবার কেহ কেহ বলেন, কাবার দেয়াল মানুষের মাথার সমান উচ্চ ছিল, ছাদ ছিল না। নিম্ন ভূমিতে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত থাকায় পার্শ্বস্থ পর্বত হইতে বৃষ্টি বা বন্যার জল গড়াইয়া

	আসিয়া কাবা মসজিদের দেয়ালের গোড়ায় জমিত, তাহাতে কাবার দেয়াল ভূপাতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ সকল কারণে উহা পুনঃসংস্কারের আবশ্যক হয়; কিন্তু প্রথমত কেহই কাবার প্রাচীর ভগ্ন করিতে সাহস করেন নাই। কারণ সকলেই বলেন, 'খোদা গৃহ ভগ্ন করা মহাপাপ।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'উহা ভাঙিয়া যখন পুনঃনির্মাণ করিব, তখন আবার পাপ হইবে কেন? কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও কেহই প্রাচীর ভাঙিতে সাহস করেন নাই। এরূপ গোলযোগে পঁচিশ বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে সকলে প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ বিভাগ করিয়া লইয়া ভাঙিয়া পুনঃনির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন, 'ইহাতে যদি কোনরূপ পাপ হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে ঐ পাপের অংশী হইব, আর যদি পুণ্য হয়, তবে তাহাও সমভাবে প্রাপ্ত হইব।' এ বিষয় স্থিরীকৃত হইলে সকলে কাবা ভাঙিয়া ফেলিয়া ভিত্তি উচ্চ করিয়া নির্মাণ করিতে মনস্থ করেন, কারণ তাহা হইলে বৃষ্টি জল আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ সিদ্ধান্ত ানুসারে কাবার চারিটি প্রাচীরের নির্মাণভার চারি সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইল। রোকনে (প্রাচীর) হজ্‌রে আসোয়াদ হইতে রোকনে এরাকী পর্যন্ত প্রাচীরের নির্মাণভার বনূ আবদে-মনাফ ও বনূ জহরার হস্তে; রোকনে এরাকী হইতে রোকনে শামী পর্যন্ত বনূ-আসাদ-ইবন-আবদেল-ওজজ ও বনূ আদুদ্দারের হস্তে; রোকনে শামী হইতে রোকনে হজ্‌রে আসোয়াদ পর্যন্ত বনূ সাহামা ও বনূ আদির হস্তে অর্পিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

কয়েকজন দুর্বৃত্ত কাবাগৃহ খনন করে সোনার হরিণ দুটি চুরি করে। কাবা গৃহের পুনঃ সংস্কারের সময় মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কলহ দেখা দেয়। এভাবে পঁচিশ বছর কেটে যায়। চারটি গোত্র পরে সবাই মিলে পুনঃ সংস্কারের কাজে হাত দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. গজালল কাবা কী?	১.
২. কাবাগৃহ পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন?	১.

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কাবাগৃহের নির্মাণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মাদ (স.) কিভাবে হজরে আসোয়াদ স্থাপনের কলহের মীমাংসা করলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
তদ্দর্শন – তা দেখে। **সম্মতি** – মত দেয়া। **অর্ণবপোত** – জলযান, জাহাজ। **আক্‌দোদম** – (আরবি শব্দ) শোনিতের প্রতিজ্ঞা, রক্ত শপথ।	সকলে প্রাচীর খননকার্যে নিযুক্ত হইলেন। একদিন একখানি প্রস্তর খনন করিয়া বাহির করিলে, তাহা হঠাৎ গড়াইয়া গিয়া পূর্বস্থানে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সকলে ভাবিলেন যে, বোধ হয় এ কার্য বিধাতার অভিপ্রেত নহে। একজন বলেন, 'সদুপায়ে অর্থোপার্জন দ্বারা কাবার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা উচিত।' তজ্জন্য সকলে সদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু কেহ প্রাচীর খননে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। পরে ওলীদ-বিন-মগিরা শাবলহস্তে অগ্রসর হইয়া প্রাচীর খনন করিতে লাগিলেন; তৎপরে অপর সকলে তাহার অনুসরণ করিল। এ সময়ে রোম-নগরের একখানি অর্ণবপোত জেদ্দার 'নিকটস্থ সমুদ্রে ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহার কাঠ ওলীদ-বিন মগিরা ক্রয় করিয়া আনেন। সেই পোতে বকুম নামক একজন বহুদর্শী রোমীয় শিল্পী ছিল, সে অতি কষ্টে তীরে উপনীত হইয়াছিল। ওলীদ তাহাকে আনিয়া কাবা নির্মাণকার্যে নিযুক্ত করিলেন। এরূপে ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে কাবার নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেল। অবশেষে হজ্‌রে আসোয়াদকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টস্থানে স্থাপন করিবে, ইহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজ্‌রে আসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কাহার কথায় মনঃসংযোগ করিল না। আবদুদ্দারের বংশীয় লোকগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, 'আমাদের দলস্থ একজন জীবিত থাকিতে অন্য দলস্থ লোকদিগকে এ পবিত্র কার্য কোনক্রমেই সম্পন্ন করিতে দিব না।' এ প্রতিজ্ঞাকে 'আক্‌দোদ্দম' অর্থাৎ শোণিতের প্রতিজ্ঞা বলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপে কিছু সময় অতীত হইয়া গেল। ওলীদ-বিন-মগিরা বলিলেন, ' এরূপে বিবাদে অনর্থক আমাদের ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।' সকলে এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। ওলীদ বলিলেন, 'যে ব্যক্তি অতি প্রত্যুষ বনূ-সায়রা দ্বার দিয়া বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলে আমরা তাহার উপদেশানুসারে কার্য করিব।' এ কথায় সকলে সূর্যোদয়ের পূর্বে উক্ত দ্বারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। যথাকালে দেখিতে পাইলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) ঐ দ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিল। সকলে বলিলেন, 'মুহাম্মদ সুবিবেচক, ইহার কথা কেহ অগ্রাহ্য করিও না।' তৎপরে তাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর বিবাদ মীমাংসার ভার দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) সকলের বিভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া স্বীয় গাত্র হইতে একখানি বস্ত্র লইয়া ভূমিতলে বিস্তৃত করিলেন এবং স্বহস্তে হজ্‌রে আসোয়াদকে উত্তোলনপূর্বক উক্ত বস্ত্রের মধ্যস্থলে রাখিয়া বলিলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি এ বস্ত্রের কোণ ধরিয়া উত্তোলন করুন; ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পুণ্যের সঞ্চার হইবে।' চারি দলের প্রধান পুরুষ আতবা-ইবন-রাবিয়া, আবু জম্‌য়া, হোজাইফা-বিন-মগিরা এবং আদি-ইবন-য়্‌স কর্তৃক প্রস্তরখানি সমভাবে উত্তোলিত হইলে, কে উক্ত বস্ত্র হইতে তুলিয়া উপযুক্ত

	স্থানে স্থাপন করিবে ইহা লইয়া আবার মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং ঐ প্রস্তরখানি বস্ত্র হইতে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলেন। তখন সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া গেল। এ ঘটনায় এ ইঙ্গিত ছিল যে, একশ্বেরবাদ-ধর্মের মন্দিরের পূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হস্তে সমাধা হইল। হাদিসে উল্লেখ আছে, 'নবুয়তরূপ সৌধের শেষ ইষ্টক স্বরূপ আমি।'

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীর খননের সময় বিরোধ উপস্থিত হয় 'হজরে আসোয়াদ' নামক কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে। অধিক পূণ্য সঞ্চয়ের আশায় এ বিশেষ প্রস্তরটি কাবাগৃহে স্থাপনের জন্য প্রত্যেক গোত্রই সমানভাবে আগ্রহী। অবশেষে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ এবং আবদুদ্দারের বংশীয় লোকেরা কঠিন রক্ত শপথ নিয়ে বলল তাদের বংশের একজন লোকও জীবিত থাকা পর্যন্ত অন্য দলের কোন লোক পবিত্র প্রস্তর স্থাপন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ওলিদি বিন মুগীরার কথানুযায়ী স্থির হলো যে, পরদিন প্রত্যূষে বনু সায়রা দ্বার দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম বের হবেন তার মীমাংসা ও উপদেশানুসারে এ প্রস্তর স্থাপিত হবে।

ঘটনাক্রমে পরদিন হযরত মুহম্মাদ (স.) সে দ্বার দিয়ে বের হবার সময় চার গোত্রের অপেক্ষমান লোকেরা তাঁকে বিরোধটি মীমাংসা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা অনায়াসে সে রক্তক্ষয়ী জটিল সমস্যার সমাধান করে দিলেন। হযরত মুহম্মাদ (স.) তাঁর গায়ের বস্ত্র খণ্ডটি মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর প্রস্তরটি রাখলেন এবং চারগোত্রের চারজন প্রধান ব্যক্তিকে বস্ত্রটির চার কোনায় ধরার জন্য অনুরোধ জানালেন। বস্ত্রখণ্ডে রক্ষিত প্রস্তরটি ভূমি থেকে তোলা হলে তিনি প্রস্তরটি নিজ হাতে তুলে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন। এ ভাবে পবিত্র গৃহের পূর্ণতা হযরত মুহম্মাদ (স.) এর হাতেই সাধিত হল।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হযরত মুহম্মদ (স.) দুর্ভিক্ষের সময় কী করেছিলেন সে সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- দুর্ভিক্ষের সময় চাচা আবু তালিবের প্রতি মুহম্মদ কী আচরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
খুল্লতাত – চাচা। **তদবধি** – তখন থেকে। **প্রপীড়িত** – নির্যাতিত।	এ সময়ে আরব দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন কুর্‌য়শ নেতাগণ সকলেই নিজ নিজ পরিবারবর্গ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কেহ কাহারও তত্ত্বাবধান করা ত দূরের কথা বরং জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিত না। তদবস্থায় বহু লোক অন্নাভাবে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক সময়ে সেই দয়ার সাগর, যিনি মহাবিচারের দিনে 'উম্মতি' 'উম্মতি' বলিয়া ডাকিবেন, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি স্বীয় সহধর্মিনী খাদিজা বিবির সঞ্চিত ধনরাশি অকাতরে দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রপীড়িত দম্পতি তখন দরিদ্রগণের পিতামাতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদেরই স্নেহ-দৃষ্টিতে দরিদ্রদিগের অন্নাভাব দূরীভূত হইয়া গেল, অন্নাভাব বলিয়া তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। আবু তালিব তখন নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় নিপতিত এবং পরিবার-পোষণে নিতান্ত অসমর্থ। হযরত মুহাম্মদ (স.) নবম বৎসর বয়সে ঐ পিতৃব্যের আশ্রয়ে গিয়া পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তিনি এক্ষণে পিতৃব্যের ঐ ঋণ

	পরিশোধ করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আবু তালিবের শিশুপুত্র হযরত আলীকে প্রতিপালনার্থে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও অনুকরণে আবু তালিবের অপর এক পুত্র হযরত জাফরের প্রতিপালন ভার তাঁহার খুল্লতাত হযরত আব্বাস গ্রহণ করিলেন। কেবল আকেল নামক পুত্রটিই আবু তালিবের নিকট রহিলেন। এরূপে সেই মহাদুর্ভিক্ষ সময়ে আবু তালিবের সাংসারিক ব্যয়ের অনেক লাঘব হইল। হযরত আলী তদবধি অনেক দিন পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিপালনাধীনে ছিলেন। হযরত (স.) পরম যত্নে তাঁহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

সার-সংক্ষেপ

এক সময় মক্কা নগরীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কারো মুখের পানে তাকায়নি। হযরত মুহম্মাদ (স.) তাঁর সহধর্মিনী বিবি খোদেজার সমস্ত ধনসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। এতে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের লাঘব হলো। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃব্য আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত হযরত মুহম্মাদ (স.) পিতৃব্যপুত্র আলীকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন।

পাঠ ৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হযরত মুহম্মদ (স.) দাসদাসীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতেন তা লিখতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ (স.) কে কেন সবাই "আল-আমীন" বলে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
কর্ণগোচর – শোনা। **আল-আমীন** – বিশ্বাসী, সত্যবাদী। **গুণগ্রাহীতা** – অন্যের গুণ গ্রহণ করার মর্যাদায়। **উম্মতি** – আমার উম্মত। **মহাবিচারের দিন** – কেয়ামতের দিন। **উক্তবিধ** – উল্লেখিত বিধি বা মতানুসারে।	আরবদেশে দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক সংগতিপন্ন ব্যক্তিরই দাসদাসী থাকিত। কিন্তু আরবেরা তাহাদের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত। দেশের নিয়মানুসারে নিরীহ দাসদাসীগণকে অকাতরে নানা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। আরবগণ কেহ কখনও দাসদাসীগণের দুর্দশা ঘুচাইবার জন্য কোনরূপ যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই। হযরত মুহাম্মদ (স.) দাসদাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহদৃষ্টিপাত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ইতিহাসে ঐ ঘটনা এরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জায়েদ নামক এক আরব বালক শত্রুদল কর্তৃক ধৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হয়। খাদিজা বিবির ভ্রাতৃষ্পুত্র হাকেম বিন-খারাম ওকাজ মেলা হইতে ইহাকে চারিশত দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিয়া খাদিজা বিবিকে উপহার দেন। পতিপরায়ণা খাদিজা বিবি ঐ দাসকে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে তাঁহার পরিচর্যার জন্য প্রদান করেন। হযরত ঐ বালকের প্রতি একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহার লালন-পালন করিতে থাকেন এবং তাহাকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাহার প্রতি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর স্নেহ ও সাদর-সম্ভাষণাদি শ্রবণ করিয়া আরববাসী অনেকেই মনে করিত যে, জায়েদ দাস নহে-মুহম্মদের পুত্র। জায়েদের পিতা হারিস পুত্রের সন্ধানে মক্কায় আসিয়া দেখিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাহাকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। হারেস ইহা দেখিয়া জায়েদকে বাড়িতে লইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু জায়েদ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্নেহপাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, সে কোনরূপে পিত্রালয়ে

	যাইতে সম্মত হইল না। এ জায়েদ যাবজ্জীবন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ছিল। খাদিজা বিবির সহিত বিবাহের পর পনর বৎসর কাল হযরত মুহাম্মদ (স.) নানা সৎকর্মে ও সদনুষ্ঠানাদিতে অতিবাহিত করেন। তিনি অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাগণের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়স্থল স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহার যে কোন অভাব বা অভিযোগ হউক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কর্ণগোচর করিলে তিনি অবিলম্বে সে অভিযোগের প্রতিকার করিতেন। এজন্য সকলে তাঁহাকে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) এ গৌরবান্বিত উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি যেদিকে চলিয়া যাইতেন, সেই দিকেরই ঐ শ্রেণীর লোক 'আল-আমীন', 'আল আমীন' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইত। তিনি যাহাদের নিকট বাল্যকালে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, সেই কুরয়শ বংশীয়গণও তাঁহার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্তবিধ সম্মানিত উপাধিতে আহ্বান করিতেন। পরম করুণাময় খোদাতাআলা তাঁহাকে স্বর্গীয় আদেশে ভূষিত করিবার পূর্বে তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা তাঁহাকে এরূপ উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন, যাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না।

সার-সংক্ষেপ

আরবদেশে দাসপ্রথা ছিল সুদীর্ঘ কালের প্রচলিত নিয়ম। দাসদের প্রতি তাদের অর্থশালী প্রভূরা পশুর মত নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করত। হযরতের সেবা করার জন্য জায়েদ নামে একজন ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল। তিনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু জায়েদ হযরত মুহম্মাদ (স.) এর এতই স্নেহভাজন ছিলেন যে পিতা হারেসের অনুরোধে তিনি পিতার কাছে পর্যন্ত যাননি। তিনি সারাজীবন হযরত মুহম্মাদ (স.) এর কাছেই ছিলেন। বিবি খোদেজাকে বিয়ের পর পনের বছর কাল হযরত মুহাম্মদ (স.) নানা সদানুষ্ঠানে ও সৎকর্মে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তিনি ছিলেন আল-আমীন বা সত্যবাদী। তাঁর বিরুদ্ধবাদী কুরায়েশরাও তাঁকে সম্মানিত এ উপাধিতে আহ্বান করত।

আরবে হযরত মুহম্মদ (স.) প্রথম দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. "হলফ-উল-ফযুল বলতে কী বুঝায়?
খ. কী কারণে কাবাগৃহ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়?
গ. "হজরে আসোয়াদ" কী? এটা স্থাপনের ঘটনা বিবৃত করুন।
ঘ. হযরত মুহম্মাদ (স.) কে আল আমীন বলা হতো কেন?
ঙ. "এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কেটে গেল?"। কিরূপ অবস্থায় কার দশ বছর কেটে গেল?
চ. আকদ্দোম কী? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
ছ. কাবার পুনঃনির্মাণ কাজ কত খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়? কার তৎপরতায় এ কাজ শেষ হয়? নির্মাতা শিল্পী কে ছিলেন?
ঝ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতামহের মৃত্যুর পর মক্কার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছিল?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'হলফ-উল-ফযুল- বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ॥ হলফ-উল-ফযুল একটি প্রতিজ্ঞার নাম। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা নগরীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হাশিম ও কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্বপ্রকার অত্যাচার, অশান্তি নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ প্রতিজ্ঞাই ইতিহাসে হলফ-উল-ফযুল নামে অভিহিত। প্রসিদ্ধি আছে যে, অনেক আগে হুরহম বংশের তিনজন মহান পুরুষ নগরের অত্যাচার দমনের জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। ঘটনাচক্রে সেই তিনজনের নাম ছিল ফযল। আরবী ব্যাকরণে 'ফযল এর বহুবচন হলো 'ফযুল' ' তাদের প্রতিজ্ঞার নামানুসারেই হযরত (স.) তার প্রতিজ্ঞার নাম রাখেন 'হলফ-উল-ফযুল'।

প্রশ্ন : কী কারণে কাবাগৃহ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়?

উত্তর : কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, কাবার মধ্যে দুটি স্বর্ণনির্মিত হরিণ (গজালল কাবা) ছিল। সে হরিণ দুটির পেটে ছিল রত্নরাজি। দুর্বৃত্তরা তা আত্মাৎ করার জন্য গোপনে কাবার ভিত্তি খনন করে। সেজন্য ভিত্তির পাশে একটি গর্ত হয়। সেই গর্তে পানি প্রবেশ করায় কাবার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কাবার দ্বারগুলি পার্শ্বস্থ ভূমির সমতল অবস্থায় ছিল বলে বৃষ্টি হলেই কাবাঘরে পানি ঢুকত। আবার অনেকে বলেন কাবাঘরের দেয়াল মানুষের মাথার সমান উঁচু ছিল, ছাদ ছিলনা, ফলে পার্শ্বস্থ পর্বত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে এসে কাবার দেয়ালের গোড়ায় জমতো। ফলে কাবার দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সকল কারণে কাবাঘর পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশ্ন : হজরে আসোয়াদ কী? এটা স্থাপনের ঘটনা বিবৃত করুন।

উত্তর : হজরে আসোয়াদ হলো কালো পাথর। কাবাগৃহ পুনঃসংস্কারের জন্য খননের সময় একখানি প্রস্তর ছিটকে বেরিয়ে আসে। এ প্রস্তরটিই হজরে আসোয়াদ।

এ প্রস্তরটি কারা সঠিক স্থানে স্থাপন করবে, তা নিয়ে মক্কার কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সাব্যস্ত হলো যে, যে ব্যক্তি অতি প্রত্যূষে বনু সায়বা দ্বার দিয়ে বের হবেন, তিনি তাদের মীমাংসা করে দেবেন। পরদিন দেখা গেল উক্ত দ্বার দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) বের হচ্ছেন। তখন তারা মুহাম্মদ (স.) এর উপরই বিবাদ মীমাংসা করার ভার দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব কথা শুনে নিজের গায়ের চাদর মাটিতে বিছিয়ে তার মধ্যে প্রস্তরটি রাখলেন। অতঃপর চার গোত্রের চার গোত্র প্রধানকে চারকোণা ধরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে পাথরটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন। এ হলো 'হজরে আসোয়াদ' স্থাপনের ঘটনা।

প্রশ্ন : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল-আমীন' বলা হতো কেন?

উত্তর : আল-আমীন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল থেকেই ছিলেন সচ্চরিত্রের অধিকারী। নানা সৎকর্ম ও সদানুষ্ঠানে যোগদান করা ছাড়াও তিনি ছিলেন অসহায় দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রত্যেকের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হয়ে তার বংশের লোকেরাই তাকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন : "এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল" কিরূপ অবস্থার কার দশ বছর কেটে গেল।

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার নবুয়ত লাভের পূর্বেও বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সবার সঙ্গে হাসিমুখে অংশগ্রহণ করতেন। কেউ বিপদে পড়লে তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। মানব সমাজের মধ্যে অবস্থান করে এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক কাজে যোগদান করে খোদার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দশ বছর কেটে গেল।

প্রশ্ন : আকদোদ্দম কী? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : হজরে আসোয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনকে কেন্দ্র করে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রত্যেক দলের লোক এটাকে স্থাপন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আব্দুদ্দারের বংশীয় লোকেরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকতে এ কাজ অন্য কাউকে করতে দেবেনা। এ প্রতিজ্ঞা 'আকদোদ্দম' বা শোনিতের প্রতিজ্ঞা নামে পরিচিত।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "আদর্শ মহাপুরুষ প্রবন্ধ অনুসরণে হযরত মুহম্মাদ (স.) এর চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় দিন।
২. শেখ আব্দুর রহিম রচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. "আদর্শ মহাপুরুষ" অবলম্বনে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন : 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ অনুসরণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মানব শ্রেষ্ঠ। মানুষের সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ও সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রের মধ্যে। তাই তিনি ছিলেন আদর্শ মহাপুরুষ।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অসৎ প্রবৃত্তিকে দএ করতে পেরেছিলেন। ফলে এ বিপদ সঙ্কুল সংসার পারাবারে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তিনি জীবনতরী বেয়ে গিয়েছেন। নানা প্রকার বিঘ্ন ও সমস্যায় তিনি সহাস্য ও ধৈর্যশীল থেকেছেন; মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় করেছেন। বস্তুতপক্ষে সংসার জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মিলে নির্মলভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে এরূপ সাংসারিক কর্মকুশলতার সুন্দর পরিচয় পাই আমরা।

ধনশালিনী রমনী বিবি খোদেজাকে বিবাহ করার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। বিবাহের পর বিবি খোদেজা তার বিপুল সম্পত্তি হযরতের চরণতলে উৎসর্গ করেন। দরিদ্র মানুষের জন্য হযরতের অন্তরে ছিল অসীম স্নেহ ও করুনাধারা। তিনি বিবি খোদেজার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তা অকাতরে গরীবের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন।

মক্কা নগরীর সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য হাশিম ও কুরায়েশ বংশের প্রত্যেক শাখার যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হলফ-উল-ফযুল' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতি গঠনের ফলে মক্কাবাসীদের জীবনে নেমে আসে শান্তি, নিশ্চয়তা ও শৃঙ্খলা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমিতি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে লক্ষ করা যায় তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব।

মক্কায় বিবদমান চার গোত্রের মধ্যে 'হজরে আসোয়াদ' স্থাপন নিয়ে যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তাঁর সহজ ও সুন্দর সমাধান করে দেন। এ ঘটনায় হযরতের চরিত্রে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ন্যায় বিচারবোধ দেখা যায় তা সত্যিই বিস্ময়কর।

আরবদেশে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন কুরায়েশ ও আরবের অন্যান্য ধনী ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারবর্গ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই চরম দুর্দিনে উম্মতের দুঃখে বিগলিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বিশাল সম্পত্তি জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য বিলিয়ে দেন। তিনি ছিলেন গরীব জনসাধারণের পরম আশ্রয়স্থল। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি পিতৃব্যপুত্র হযরত আলীকে লালন পালন করেন। প্রভুদের অমানুষিক উৎপীড়ন থেকে তিনি দাসদাসীদের রক্ষা করেন। ক্রীতদাস জায়েদকে তিনি পুত্রের মতো লালন-পালন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও মক্কার জনসাধারণ তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক নির্মলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "আল-আমিন" আখ্যা দিয়েছিল। দুর্লভ এ গৌরব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র মাহাত্মেরই পরিচয় দান করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন পদ্ধতি, কর্ম ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন যথার্থ আদর্শ মহাপুরুষ।

প্রশ্ন : 'আদর্শ মহাপুরুষ' অবলম্বনে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের প্রসঙ্গটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

উত্তর : কাবাগৃহের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত দুটি হরিণ এর প্রতিমূর্তি ছিল। মূর্তি দুটির পেটের মধ্যে ছিল অনেক মণিমাণিক্য। দুর্বৃত্তরা দেয়ালের নিচে গভীর গর্ত খনন করে হরিণ দুটি চুরি করে। সেই গর্তে বৃষ্টির পানি জমলে কাবাগৃহ পতনোন্মুখ হয়। বৃষ্টির সময় সেই পানি প্রবেশ করতো কাবাঘরের মধ্যে, কেউ কেউ বলেন কাবাঘরের দেয়াল ছিল মাথার সমান উচুঁ, ঘরের ছাদ ছিল না। নিম্নভূমিতে অবস্থিত কাবা গৃহের দেয়ালের গোড়ার উচ্চভূমির পানি এসে জমলে দেয়াল ভূপতিত হবার উপক্রম হয়। এ সব কারণে কাবাগৃহ সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউই খোদার ঘরের দেয়াল ভাঙ্গতে সাহসী হয় না। বলে কাবা ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা মহাপাপ, আবার কেউ কেউ বলে ভেঙ্গে নতুন করলে পাপ হতে পারে না। পরিশেষে স্থির হয় এক এক দল বা ব্যক্তি কাবার এক এক অংশ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করবে।

এতে যদি পাপ হয় সবাই তার ফল ভোগ করবে পুণ্য হলে সবাই তার অংশ পাবে। স্থির হলো কাবাগৃহ ভেঙ্গে উচ্চ ভিত্তির ওপর তা পুনরায় নির্মাণ করা হবে। চারটি দেয়ালের নির্মাণের দায়িত্ব চার দলের ওপর ন্যস্ত হয়। চারটি দল বা সম্প্রদায়ই ছিল কোরেশ বংশের।

খনন কার্য শুরু হলে একদিন একখানি পাথর গড়ায়ে গিয়ে আবার পূর্বস্থানে পতিত হয়। তা দেখে তাদের মনে হয় কাবা গৃহ ভাঙ্গা বোধ হয় আল্লাহর ইচ্ছে নয়। একজন বলেন সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা কাবাগৃহ ভেঙ্গে গড়তে হবে। তখন সবাই সদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে আসেন, কিন্তু প্রাচীর খনন করতে কেউই সাহসী হয় না। পরিশেষে ওলীদ-বিন-মগিরা মাবল খনন কার্যে অগ্রসর হলে সবাই তার অনুসরণ করেন। রোমের একজন দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে কাবার পুণঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) "গন্তব্যপথ মহা বিপদ সংকুল। এ প্রবাস মহা বিভীষিকাপূর্ণ।"

খ) "একদিকে বিবেক ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মক জ্যোর্তিময় করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছে।"

গ) "একেশ্বরবাদ ধর্মের মন্দিরের পূর্ণতা হযরত মুহম্মাদ (স.) এর হস্তে সমাধা হইল।"

ঘ) "নিশ্চয়ই তিনি খোদাতাআলার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

ক) গন্তব্যপথ ..... মহাবিভীষিকাপূর্ণ।"

আলোচ্য অংশটুকু শেখ আব্দুর রহমান রচিত 'আদর্শ মহাপুরুষ' নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখক পার্থিব জীবনের লোভে মোহ জয় করে স্রষ্টার আরাধনায় মগ্ন থাকা যে কত কঠিন, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্রষ্টার সৃষ্টি অনন্ত রহস্যে আবৃত। এখানে পদে পদে আছে বিপদ। লেখক তাই এ পৃথিবীকে মনে করেছেন প্রবাস স্থান। মানুষ এখানে ক্ষণকালের যাত্রী মাত্র। তারপর তাকে যেতে হবে চিরস্থায়ী আবাস পরকালের পথে। পৃথিবীর জীবন নানা বিপদে আকীর্ণ। এ বিপদ থেকে পবিত্রাণের একমাত্র উপায় স্রষ্টার অনুগ্রহ। পৃথিবীর বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশে যেখানে জ্ঞানীর জ্ঞান লুপ্ত, বিদ্বান বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সেখানে একমাত্র সহায়ক হতে পারে স্রষ্টার অশেষ অনুগ্রহ ও করুণা। তাই তিনি পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান কালকে বিপদ সংকুল ও বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ বলেছেন।

পার্থিব জগতের বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ থেকে স্রষ্টার অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় নেই।

খ. একদিকে বিবেক ..... ধ্বংস সাধন করিতেছে।

আলোচ্য অংশটুকু শেখ আব্দুর রহিম রচিত "আদর্শ মহাপুরুষ" নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখক আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

স্রষ্টা মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে তৈরী করেছেন। তার মধ্যে আত্মদিয়েছেন, দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ পৃথিবীর নানা জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে কল্যাণকামিতা থেকে দূরে সরে যায়। ঐশ্বরিক জ্ঞান তার আত্মক আলোকিত করে তোলে বটে, কিন্তু অন্যদিকে সে চলার পথে প্ররোচিত হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নানা কুপ্রবৃত্তির দ্বারা। এ অবস্থায় আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ ব্যতীত মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়।

মানবাত্মা উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায় হলো নিজেকে স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন রাখা।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

ক. বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করুন

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হযরত মুহম্মাদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন সুতরাং তাঁর ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না কিন্তু খোদেজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব দূরীভূত হইয়া গেল

খ. প্রতিশব্দ লিখুন

ইচ্ছা, গৃহ, আকাশ, স্ত্রী, পৃথিবী।

গ. একই পদের ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান

হাত, মুখ, খাওয়া, চোখ, মাথা।

ঘ. চলিত রীতিতে রূপান্তরিত করুন

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টস্থানেস্থাপন করিবে, ইহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজরে আসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কাহারো কথায় মনঃসংযোগ করিল না।

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার :

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মাদ (স.) নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন-দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু খোদেজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া গেল।

প্রতিশব্দ

ইচ্ছা – অভিপ্রায়, বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, ইপ্সা, কামনা, বাঞ্ছা, সাধ।

গৃহ – আগার, আবাস, আলয়, ভবন, গেহ, নিকেতন, নিলয়, বাটি, বাড়ি, মন্দির, সদন।

আকাশ – গগন, নভঃ, অভ্র, অম্বর, অন্তরীক্ষ, আসমান, নভোমণ্ডল।

স্ত্রী – অবলা, নারী, দারা, কান্তা, পত্নী, গৃহিনী, বণিতা, বধূ, অঙ্গনা, জায়া, বামা, রমনী, মহিলা।

পৃথিবী – অবণী, ক্ষিতি, বসুধা, ধরিত্রী, পৃথ্বি, জগৎ, ধরণী, ধরা, বসুন্ধরা, ভুবন, বিশ্ব।

একই পদের ভিন্নার্থক প্রয়োগ

হাত

হাত – আমার হাতে ব্যথা পেয়েছি।

ক্ষমতা – এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

কাজ করা – একটু হাত লাগাও, কাজটা এখনই শেষ হয়ে যাবে।

অধিকার কমানো – না জেনে এখানে হাত দিও না।

মুখ

গম্ভীর ভাব – সারাদিন মুখ ভার করে থেকো না।

সংযত হওয়া – মুখ সামলিয়ে কথা বলবে।

আশা করা – খুব বড় মুখ করে এসেছি, এ কাজটা করে দিতেই হবে।

ভরসা করা – শুধু তোমার মুখ চেয়ে, সেদিন রহিমকে কিছু বলিনি।

চোখ

জ্ঞান – এ ব্যাপারে এখনো তার চোখ ফুটেনি।

দৃষ্টিরাখা – মেয়ে বড় হয়েছে, এখন একটু চোখ রাখতে হবে।

শত্রু– সৎমার কাছে আমি তো চোখের বালি।

হিংসা – একজনের উন্নতিতে আরেক জনের চোখ টাটালে কোন লাভ নেই।

মাথা

মেধা – শাহীনের অংকে মাথা আছে।

প্রধান – শফিক সাহেব আমাদের গ্রামের মাথা।

প্রতিজ্ঞা – মাথা খাও, ভুলো না যেন, খেয়ো মনে করে।

ছোট হওয়া – শুধু তোমার জন্যে সেদিন বিচারে আমাদের মাথা হেঁট করে আসতে হলো।

সাধু রীতিতে রূপান্তর

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন্ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করবে, এ নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হলো। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজ্‌রে আসোয়াদকে স্থাপন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কেউ কারো কথায় মনঃসংযোগ করল না।

সৃজনশীল কাজ

কোন মহান ব্যক্তির সম্পর্কে নিজ ভাষায় দুটি অনুচ্ছেদ লিখুন।